দারসে কুরআন সিরিজ-০১

সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ- ১

সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক: **খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির**
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ, মে– ১৯৮৭ ইং
পঁচিশতম প্রকাশ, জুন– ২০১৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ: আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য: **৪০/- (চল্লিশ টাকা মাত্র)**

www.pathagar.com

সূচীক্রম

সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা	
মুখবন্ধ	০৫
নামকরণ	০৫
সূরা ফাতেহা একটি সর্বোত্তম মুনাজাত	০৭
৭টি মৌলিক শিক্ষা সহ ৭ আয়াতের সূরা ফাতেহা	০৮
১নং শিক্ষা	১০
২নং শিক্ষা	৭
যারা খোদায়ী দাবী করেছিল তাদের মূল দাবী কি ছিল?	১৪
দুনিয়ার অশান্তির মূল কারণ মানুষ মানুষের উপর 'রব' হয়ে চেপে বসা	১৫
আল্লাহকে কেন رب বলে মানতে হবে?	১৭
আমাদের সাধারণ খাদ্য	১৯
পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহর রবুবিয়াতের ব্যবস্থাপনা	২২
علمين (জগৎ সমূহ)	২৪
৩নং শিক্ষা	২৬
৪নং শিক্ষা	২৮
৫নং শিক্ষা	২৯
نعبد শব্দের তাৎপর্য	৩১
৬নং শিক্ষা	৩৫
৭ নং শিক্ষা	৩৫
الصراط المستقيم এর ২য় ব্যাখ্যা	৩৭
مستقيم এর ৩য় ব্যাখ্যা	৩৯
الصراط المستقيم এর ৪র্থ অর্থ	৪০
বুদ্ধিমানের লক্ষণ	৪৪
صراط المستقيم এর ৫ম ব্যাখ্যা	৪৫
সিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা ইসলামী পথ ও পরিবেশ কি ও কেন?	৪৬
মালিক হিসেবে আল্লাহর পরিচয়	৪৮
মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যা দাবী করে	৫০
আনুসাংগিক আয়াতসমূহ	৫৩

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সূরা ফাতিহা আল-কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। এটি একটি মোনাজাত। মানুষের মনের মনিকোঠায় কি জাগ্রত হয় তা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সব চাইতে বেশী জানেন। পথহারা মানুষ একমাত্র তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই সঠিক পথের সন্ধান চাইতে পারে। ইহাই মানব মনের আকুতি। আর এই আকৃতিই ভাষায় রূপদান করে আল্লাহ স্বয়ং সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেছেন যাতে মানুষ প্রকৃত চাওয়ার বস্তুটি কি হতে পারে, কার কাছে চাওয়া যেতে পারে এবং কেমন করে চাওয়া যাবে তা শিখে নিতে পারে। আর এই চাওয়ার জবাবেই আল্লাহ দিয়েছেন গোটা আল-কুরআন যাহা পথহারা মানুষের একমাত্র পথের দিশা।

এ সূরাটির গুরুত্ব তাই এত বেশী যে উহা প্রত্যেক নামাজেই পড়তে হয়। এর মত এত বেশী নিত্যপাঠ্য আর একটি সূরাও নেই। তাই এর প্রতিটি বাক্য, শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য খুঁটিনাটিসহ জেনে নেয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

গ্রন্থাকার উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দারসটি রচনা করেছেন। তাঁর উপস্থাপনায় সূরাটির কেন্দ্রীয় ধারণা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অল্প কথায় এমন প্রাণবন্ত ও বিপ্লবী ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে আর লক্ষ্য করা যায়নি। তাই আমরা এ দারস প্রতিটি মু'মিন মুসলমানের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে এর সংশোধিত ৫ম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। সম্মানীত পাঠক এ দারসের বিষয়বস্তু হৃদয়াঙ্গম করে এর থেকে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ইতি

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ -

(আল্লাহ বলেন, হে রাসূল) আমি তোমাকে ৭টি নিত্যপাঠ্যবাণী দান করেছি এবং (তৎসহ) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ -

(রাসূল বলেন) আস্‌সাব্‌য়ুল মাছানি থেকে সূরা ফাতেহা এবং কুরআনাল আজীম থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থকে বুঝান হয়েছে।

এই সূরা ফাতেহার কথাই রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

সূরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাযই সম্পন্ন হবে না।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, সূরা ফাতেহা অবশ্যই এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের ও গুরুত্বের অধিকারী যার কারণে তা আল-কুরআনের শীর্ষস্থানে স্থান পেয়েছে।

বস্তুতঃ এ সূরার ৭টি আয়াতের মধ্যে এমন ৭টি মৌলিক শিক্ষা রয়েছে যা বিহনে মানুষ কোন ক্রমেই ৭টি দোযখের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে না। সে ৭টি মৌলিক শিক্ষা যে কি তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এ ছোট্ট পুস্তিকায়।

www.pathagar.com

নামকরণ

এ সূরার কতকগুলো নাম রয়েছে যার মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা–

১। اَلْفَاتِحَةُ (আল ফাতিহাতু) অর্থ মুখবন্ধ, ভূমিকা, উদ্বোধন, দ্বারোদঘাটন ও প্রারম্ভিকা। রাসূল (সঃ) এ সূরাকেই বলেছেন فَاتِحَةُ الْكِتَابِ (ফাতিহাতুল কিতাব) এ থেকেই এ সূরার নাম হয়েছে সূরা ফাতেহা।

২। اَسَاسُ الْقُرْاٰنِ (আসাসুল কুরআন) বা কুরআনের মূলভিত্তি।

৩। اَلْكَافِيَةُ (আল-কাফিয়া) বা স্বয়ং সম্পূর্ণ বা যথেষ্ট।

৪। اَلْكَنْزُ (আল-কান্য) বা ধনভান্ডার।

৫। اُمُّ الْقُرْاٰنِ (উম্মুল কুরআন) বা কুরআনের জননী।

আরবীতে উম্মুন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন اُمُّهٗ (উম্মুহু) তার মা اُمُّ الرَّاْسِ (উম্মুর রাস্) মাস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থল। اُمُّ الْقُرٰى (উম্মুল কুরা) জনগণের সমাবেশ স্থল। কাবা শরীফকে বলা হয় উম্মুল কুরা এবং সেনাবাহিনীর পতাকাকেও আরবীতে বলা হয় উম্মুন। সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলায় উম্মুন শব্দের এ সবগুলো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। যেমনঃ

১। এ সূরার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে গোটা কুরআন- তাই একে বলা চলে 'কুরআনের মা'।

২। এ সূরাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে গোটা কুরআন, তাই সংগত কারণেই বলা চলে (এ সূরা 'গোটা কুরআনের কেন্দ্রস্থল'।

৩। যেহেতু মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মৌলিক শিক্ষার সমাবেশ ঘটেছে এ সূরার মধ্যে, তাই একে বলা চলে 'মৌলিক শিক্ষার সমাবেশ স্থল'।

৪। এ সূরার মৌলিক শিক্ষাগুলোই ইঙ্গিত বহন করে গোটা কুরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলোর প্রতি, তাই একে আল-কুরআনের নিশানা বা পতাকাও বলা চলে।

www.pathagar.com

সূরা ফাতেহা একটি সর্বোত্তম মুনাজাত

সূরা ফাতেহা হচ্ছে মানব জাতির জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট এক চরম চাওয়া, যার চাইতে অধিক দামী আর কিছু আল্লাহর নিকট আমাদের চাওয়ার মত হতে পারে না। চরম চাওয়ার পর বাকি থাকে চরম পাওয়া। আল-কুরআনই হচ্ছে সেই চরম পাওয়া, যার চাইতে অধিক মূল্যবান আর কিছু আল্লাহর নিকট থেকে এই দুনিয়ায় আমাদের পাওয়ার মত হতে পারে না।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট সব চাইতে মূল্যবান যা চাই তা হচ্ছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

হে আল্লাহ! দেখাও আমাদেরকে সরল সোজা পথ, যে পথে চলে দুনিয়াতে পাব শান্তি আর পরকালে পাব মুক্তি। এই চাওয়ার পর আল-কুরআন নাযিল করে আল্লাহ বললেন ঃ

اَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

(আমার দেখানো পন্থায়) আমার দাসত্ব কর, এটাই অর্থাৎ এই কুরআনই সেই সরল পথ [বা সিরাতুল মুস্তাক্বীম যা তোমরা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে আমার নিকট চেয়েছিলে] অন্যত্র আল্লাহ বললেনঃ

هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

অবশ্য আল্লাহ আমার ও তোমাদের প্রত্যেকেরই সর্বময় কর্তা ও প্রভু। কাজেই একমাত্র তাঁরই আনুগত্য কর ও উপাসনা কর। এটাই সরল সোজা পথ বা সিরাতুল মুস্তাক্বীমের সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ আমাদের সবার বাদশাহ। কাজেই আমিও তাঁরই হুকুম মেনে চলি তোমরাও তাঁরই হুকুম মেনে চল। আমিও তোমার দাসত্ব করব না তুমিও আমার দাসত্ব করবে না। দুনিয়ার কোন মানুষই কোন মানুষের দাসত্ব করবে না বা কেউই কারও নিজস্ব আইন মেনে চলবে না। সবাই আল্লাহর বান্দা (দাস) কাজেই সবাই আল্লাহর আইন মেনে চলব। এটাই হচ্ছে বেহেশ্‌ত পাওয়ার একমাত্র পথ।

www.pathagar.com

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ সূরাতুল ফাতেহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

অনুবাদ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে যিনি নিখিল বিশ্ব জাহানের রব। পরম দয়ালু ও করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। যাদের উপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

সূরা ফাতেহার মধ্যেই আল্লাহ অহির মাধ্যমে সর্বপ্রথম বললেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি জগৎসমূহের রব। কাজেই রবের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে সূরা ফাতেহার পুরো ব্যাখ্যাটিই মূল দারস হিসেবে পেশ করা হলো। এর পর ক্রমান্বয়ে مَالِكْ ও اِلٰهْ এর উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দারস পেশ করা হবে। তবে এই পুস্তিকারই শেষ অংশে مَالِكْ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়টা তুলে দেয়া হলো।

৭টি মৌলিক শিক্ষা সহ ৭ আয়াতের সূরা ফাতেহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)

শব্দার্থ ঃ ال টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি অর্থাৎ ইংরেজিতে যেখানে The ব্যবহার হয় আরবীতে সেখানে ال ব্যবহার হয়। আরও সহজ করে

www.pathagar.com

বলা চলে- কোন অনির্দিষ্ট জিনিসকে নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্যে ال শব্দ ব্যবহার হয়।

حَمْدٌ (হামদুন) প্রশংসা। আরবীতে প্রশংসা বুঝানোর জন্যে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়- যথা (এক) مَدْحٌ (মাদহুন) (দুই) حَمْدٌ (হামদুন)। মানুষ তার মানবীয় গুণের কারণে যে প্রশংসা পায় ঐটা বুঝানোর জন্যে مَدْحٌ (মাদহুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার উপায় উপাদান দিয়ে সাহায্য করার কারণে যে চূড়ান্ত প্রশংসা, ঐটা (হামদুন) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই প্রশংসাটা আল্লাহর জন্যে খাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যেমন একজন ডাক্তার তার প্রতিভা, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়, সঠিক ঔষধ নির্বাচন ও সহানুভূতি সুলভ ব্যবহারের জন্য যে প্রশংসা পেতে পারেন ঐটা হচ্ছে مَدْح শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার মত প্রশংসা। ঐটা মানুষ পাবে, কিন্তু চাবে না। আর রোগ মুক্তির জন্যে যে প্রশংসা তা ডাক্তার সাহেবের পাওনা নয়, ঐটা আল্লাহর পাওনা। কারণ ঐটার মালিক ডাক্তার সাহেব নন, আল্লাহ। لِ লি জন্য اَللّٰهِ আল্লাহ। তাহলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর অর্থ হলো প্রতিপালনের জন্যে যে প্রশংসা তার সব টুকুই আল্লাহর জন্যে খাস। এখন প্রশ্ন, নিজের প্রশংসা নিজে করা কেউই পছন্দ করে না। আল্লাহ নিজেও তা পছন্দ করেন না।

তবুও কেন আল্লাহ নিজের প্রশংসা নিজে করলেন এবং তা কেন হলো আল-কুরআনের প্রথম শব্দ? এর কারণ হচ্ছে এই যে মানুষকে শেরেকীর হাত থেকে উদ্ধার করে তৌহিদের রাস্তায় তুলে দেয়াই যেহেতু আল-কুরআন নাযিলের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য, তাই এ কাজের জন্যে সর্বপ্রথম যা বলার দরকার ছিল তা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর মূল শিক্ষা মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেয়া। কারণ এর মূল শিক্ষাই মানুষকে যাবতীয় শেরেকীর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। কিভাবে তা পারে তা এর ব্যাখ্যার মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ পাবেন।

www.pathagar.com

১নং শিক্ষা

মানুষ যেহেতু সর্বক্ষণই অভাবী তাই সে সর্বক্ষণই কারও না কারও নিকট থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেতে চায়। অতঃপর যারই নিকট থেকে কিছু সাহায্য পায় তারই প্রশংসা করে মানুষ শত মুখে। কিন্তু, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 'রব' হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই মানুষের যাবতীয় অভাব পূরণ করেন কিন্তু তা দেন কারও না কারও বা কিছু না কিছুর মাধ্যমে। আর মানুষ অজ্ঞতাবসতঃ সেই মাধ্যমকেই প্রকৃত দাতা বলে মেনে নেয়। এই ভাবে অজ্ঞ মানুষেরা যারই মধ্যে জীবন ধারণের কোন উপায় উপাদান দেখতে পেয়েছে, তখন তারই নিকট মাথা নত করেছে। এরই ফলে গাভী দুধ দিয়ে দেবতা বনল, আর নিম ও তুলসি গাছের উপকারিতা দেখে তার গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে মানুষ সিজ্‌দা করল। এভাবে জীব জানোয়ার, গাছপালা, চাঁদ সূর্য, পাথর, পীর ফকিরের মাজার, গায়েবী মস্‌জিদ ইত্যাদি বহু কিছুর মধ্যে আল্লাহর রবুবিয়াতের অংশ রয়েছে বলে মানুষ মনে করছে। মনে করেছে ঐ সব স্থানে হাজত দিলে বা মান্নত মানলে বালা মুছিবতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এ ধরণের জাহেলী ধারণা যাদের মধ্যে রয়েছে তারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে ভুল করেছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহই সব কিছুকে প্রতিপালন করেন তবে তা করেন কোন না কোন কিছুর মাধ্যমে। সে মাধ্যমগুলোর তালিকার মধ্যেই রয়েছে পিতা-মাতা, গাভী, গাছ-পালা, ডাক্তার কবিরাজ, ঔষধ পত্র ইত্যাদি হাজারও প্রকার ব্যাবস্থাপনা। কিন্তু, কিছু মানুষ ভুল করে ঐ মাধ্যমগুলোকেই রব বলে ধরে নিয়েছে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (মিন দু-নিল্লাহ্) প্রকৃত রবকে বাদ দিয়েই। আর এটাই হচ্ছে শেরেকী। যেমন আমরা জন্মের পর পরই মায়ের মাধ্যমে দুধ পাই কিন্তু সে দুধ তৈরীর মূল মালিক মা নয়; আল্লাহ। কাজেই মায়ের মাধ্যমে দুধ পেয়ে আল্‌হামদুলিল্লাহ আম্মা বলা যাবে না, বলতে হবে আলহামদু লিল্লাহ। ঠিক তেমনই সূর্যের কিরণ থেকে উপকার পেয়ে আলহামদু লিশ্বাম্‌স্ বলা যাবে না, বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ্। অর্থাৎ, উপকার করা বা প্রতিপালন করার মূল মালিক যেহেতু আল্লাহ্ তাই যে

www.pathagar.com

কোন মাধ্যম থেকেই উপকার পেয়ে বলতে হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মানুষ যেন এই ব্যাপারে ভুল না করে সে জন্যেই আল-কুরআনের প্রথম শব্দ হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মানুষ যার মাধ্যমে সাহায্য বা উপকার পায় যদি তারই চূড়ান্ত প্রশংসা করে তবে সে কাজটা কেমন হয় তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন মনে করুন, কোথাও ঝড়ে ভাঙ্গা স্কুল ঘর মেরামতের জন্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন ক্রমে সরকার স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন ক্রমে সরকার স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিশ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করল। আর মঞ্জুরীকৃত টাকাগুলো স্কুল কর্তৃপক্ষ পেল এক ব্যাংকের কেশিয়ারের হাত থেকে। অতঃপর স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি কেশিয়ারের হাত থেকে টাকা পেয়ে তাকেই মূল সাহায্যদাতা মনে করে তারই প্রশংসা করে তবে সে প্রশংসাটাও হয় যেমন, ঠিক তেমন মানুষ কারও নিকট থেকে সাহায্য পেয়ে যদি তারই চূড়ান্ত প্রশংসা করে তবে সে প্রশংসাটাও হয় তেমন। সরকারের মঞ্জুরী ছাড়া যেমন ব্যাংকের কেশিয়ার স্কুলের জন্যে একটি নয়া পয়সাও দিতে পারে না, ঠিক তেমনই আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী ছাড়া কেউ কাউকে এক বিন্দু পরিমাণও সাহায্য করতে পারে না। তাই যে কোন মাধ্যম থেকেই সাহায্য পেয়ে বলতে হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কারণ, তাঁর মঞ্জুরী ছাড়া কেউ কাউকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে না।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে এমন যে, মানুষ কাউকে কিছুমাত্র সাহায্য করলে তার বিনিময়ে সে কিছু না চাইলেও একটু প্রশংসা চায়। এ চাওয়ার অর্থই হলো যা পাওনা আল্লাহর তা পেতে চাওয়া, যা চাওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর রবুবিয়াতের দাবীদার হওয়া। আর সে দাবী নীরবে মেনে নেয়াই হচ্ছে শেরেকী। এই শেরেকীকে বলা হয় শিরকে খফি বা গোপন শেরেকী। এই শেরেকীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন বহু আল্লাহ বিশ্বাসীও। যাদের সম্পর্কে সূরা ইউসূফে আল্লাহ বলছেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ـ

এবং তাদের অনেকেই ঈমান আনে না, কিন্তু (এই অবস্থায় ঈমান

www.pathagar.com

আনে যে) তারা মুশরিক। (আয়াতঃ ১০৬) অর্থাৎ বহু ঈমানদার লোকই রয়েছে যারা মুশরিক। তারা প্রতিমার পূঁজা করে মুশরিক নয়, তারা আল্লাহর রবুবিয়াতের অংশ অন্যের মধ্যে রয়েছে বলে ধরে নেয়া বা বিশ্বাস করে। ফলে তারা আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে মানুষের বা কোন শক্তির কিংবা কোন বস্তুর প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ। এই ভুল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ তাঁর কালামে পাকের প্রথম কথার মাধ্যমেই বললেন, যিনিই বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র মালিক তথা রাব্বুল আ'লামীন, তিনিই হচ্ছেন চূড়ান্তভাবে প্রশংসা পাওয়ার হকদার এবং তিনিই হচ্ছেন রব।

২নং শিক্ষা

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (জগত সমূহের প্রতিপালক)

رَبّ এমন একটি শব্দ যার হুবহু প্রতি শব্দ বাংলায় নেই। এটা এক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার বাংলা অর্থ বলতে হলে অনেকগুলো শব্দ বলতে হবে। যথা রব অর্থ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানকারী এবং অস্তিত্ব দানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আনুসাঙ্গিক যাবতীয় কাজগুলোর ব্যবস্থাপক, যথা প্রভূ, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক, পরিচালক, অভিভাবক, মুরব্বি, মুনিব, মালিক, আইনদাতা, শাসনকর্তা, রাজা, বাদশাহ ইত্যাদি যা অস্তিত্ব দানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কার্যকলাপ তার সবগুলো বুঝানোর জন্যই আরবীতে এক কথায় বলা হয় 'রব'।

'রব' শব্দের আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জিনিসেরই অস্তিত্ব আছে ধ্বংসও আছে। আর ধ্বংস আছে তখনই যখন তাকে টিকিয়ে রাখার শক্তি যা সর্বক্ষণই প্রত্যেকটি অস্তিত্ববান জিনিসের প্রতি কার্যকর রয়েছে (যা আল্লাহ কার্যকর রেখেছেন) তা যে কোন মুহূর্তে যে কোন জিনিসের উপর থেকে তুলে নিলে সে আর এক মুহূর্তের জন্যেও টিকতে পারে না সেই শক্তি ও সেই ধরনের উপাদান যা প্রতিটি জিনিসকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যা প্রয়োজন, তা যার হাতে আছে এবং যিনি তার যথাযথ ব্যবহার করেন। সব কিছুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখছেন তাকেই বলা হয় 'রব' বা তিনিই হচ্ছেন একমাত্র 'রব'।

www.pathagar.com

টিকিয়ে রাখার উপায় উপাদান কথাটা শুনতে যত ছোট তার অর্থ তত ছোট নয়, বরং ব্যাখ্যা এত ব্যাপক যে তা মানুষের সাধ্য নেই যে বলে শেষ করতে পারে বা লিখে শেষ করতে পারে। তবুও ইশারা ইঙ্গিতে যেন কিছুটা উপলব্ধি করা যায় সে জন্যে অতি সংক্ষেপে কিছু বলছি। যেমন ধরুন-

(১) মানুষকে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন তার খাদ্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, দেহভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক চালু মেশিনকে সর্বক্ষণ চালু রাখা (যার কিঞ্চিৎ খবর রাখেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ) তার জন্যে প্রয়োজন বায়ু, বায়ুর মধ্যে পরিমিত গ্যাসীয় পদার্থ, বায়ুর একটা নিদির্ষ্ট পরিমান চাপ, জমিনের উপর দিয়ে চলা ফেরার জন্যে জমিনকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দেয়া ইত্যাদি হাজারও ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে মানুষের পিছনে।

(২) জীব জানোয়ার-যারা চাষাবাদ করে খেতে পারে না তাদের জন্যে বিনা চাষের খাদ্য-ব্যবস্থা, যারা লেপ কাঁথা তৈরী করতে পারে না তাদের গায়ে ঘন পশম দিয়ে এবং পশমকে তাপ অপরিবাহী করে পশমের মাধ্যমে লেপ কাঁথার প্রয়োজন মেটানো, যাদের চোখ নেই-(যেমন উই পোকা) তাদের অন্ধ অবস্থায় বাঁচার ব্যবস্থা করা, মাছ যেমন শীতল পানিতে বাস করতে পারে এবং সর্দি-গর্মিতে আক্রান্ত না হয় তেমন ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি বহু ধরনের ব্যবস্থাপনা কার্যকর রাখা।

(৩) আকাশের বা মহাশুন্যের মধ্যে পৃথিবীসহ যত গ্রহ-উপগ্রহ ও জ্যোতিষ্ক মন্ডলী রয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকে এমন যুক্তিসংগত দূরত্বে রাখা এবং তাদের প্রত্যেকটিকে এমন নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি দেয়া যেন স্কাইলাবের ন্যায় একটা আরেকটার মধ্যে ঢুকে না পড়ে তার ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যবস্থা যিনি তার সৃষ্টির প্রতি সর্বক্ষণই কার্যকর রেখেছেন তিনিই হচ্ছেন রাব্বুল আ'লামীন।

এবার লক্ষ্য করুন রবের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে যে কটা কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে আল্লাহর ছেফাত বা গুণ। কিন্তু, মানুষ ঐ শব্দগুলোকে অর্থাৎ প্রভু, প্রতিপালক- রাজা-বাদশাহ কথাগুলোকে মানুষের নামের সঙ্গেই যোগ করে- যার মধ্যে রয়েছে শিরকে খফি বা সুক্ষ্ম শেরেকী- যা পূর্বেও একবার বলেছি।

www.pathagar.com

যারা খোদায়ী দাবী করেছিল তাদের মূল দাবী কি ছিল?

মানুষ মনে করে ফেরাউন বুঝি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হওয়ার দাবী করেছিল। কিন্তু ফেরাউন সে দাবী করেনি। বরং সে আল্লাহকে আল্লাহ বলেই মানত। তার দাবী ছিল أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى আমি তোমাদের মহামান্য রাষ্ট্র প্রধান বা আইনদাতা ও হুকুমদাতা প্রভূ।

প্রকৃতপক্ষে বিগত যুগে যারাই খোদায়ী দাবী করেছে তারা প্রত্যেকেই মানুষের রব হতে চেয়েছে, কেহই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হ'তে চায়নি। তারা নিজেরাও নিজেদেরকে রব বলে দাবী করত এবং দেশের জনগণও তাদেরকে রব বলে মেনে নিত। যার প্রমাণ রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফে সূরা ইউসূফের মধ্যে। ইউসূফ (আঃ)-এর এক কারাগারের সঙ্গীকে তার স্বপ্নের তা'বীর বলতে গিয়ে (আলাহর ভাষায়) তিনি বলেন

فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا

সে তার রব-কে (বাদশাহকে) বুঝানো হয়েছে। অতঃপর ঐ একই সূরায় যেখানে বলা হয়েছে اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ অর্থাৎ তোমার রবের নিকট বা বাদশাহর নিকট আমার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিও, এই দুই স্থানেই রব অর্থে মিসরের বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যারাই বাদশাহ হয়ে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরী আইন আল্লাহর বান্দাদের উপর প্রয়োগ করে তাদের প্রত্যেককেই আল-কুরআনে রবের দাবীদার ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। আর ঐটা তাদের নিজেদেরও দাবী ছিল। কিন্তু আল্লাহ বলেন, মানুষ যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না তেমন সে মানুষের রবও হতে পারে না। আল্লাহ পাকের ৯৯টি সিফাতি নামের মধ্যে একমাত্র রবই এমন একটি নাম যা অন্য সব সিফাতি নামের বাইরে ভিন্ন ধরনের। এই রবের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত মানুষ যে সত্যিকার ভাবে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে শামিল হতে পারেনা, তা নিম্নের আয়াত থেকে বুঝা যাবে। ইহুদী নাসারা যারা দাবী করত যে, তারা দ্বীন মানে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা মানা হত না, তাই আল্লাহ তাদের নিকট থেকে

www.pathagar.com

তাঁর রাসূলকে ৩ দফার প্রস্তাব দিতে বললেন। বললেন যে, বল। এস আমরা-

১। اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব করব না।

২। وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا এবং তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করব না।

৩। - وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রব বলে না মানে। (সূরা আলে ইমরান ৬৪ আয়াত)

বলা বাহুল্য, মানুষ যখনই এই ৩নং শর্ত মুতাবিক একমাত্র আল্লাহকেই সত্যিকার অর্থে রব ব'লে মানতে পারে না তখনই ১নং শর্ত মুতাবিক সে একমাত্র আল্লাহরই দাস থাকতে পারে না এবং ২নং শর্ত মুতাবিক মানুষকে রব হিসেবে মানলে যে শেরেকী হয় সে শেরেকীর হাত থেকে মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও উদ্ধার পেতে পারে না।

আরবদের পূর্বেই জানা ছিল আল্লাহর নাম আল্লাহ, কিন্তু رَبّ এর ব্যাখ্যা তারা জানত না। মানুষের রব যে একমাত্র আল্লাহ তা বুঝানোর জন্যে আল্লাহ তা'আলা যতবার মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কের কথা বলেছেন ততবার রব শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন-

رَبُّ النَّاسِ رَبُّكَ رَبُّكُمَا-رَبُّكُمْ - رَبُّهٗ رَبُّهُمَا رَبُّهُمْ رَبِّىْ رَبُّنَا-

এভাবে আল-কুরআনে ৯৭৮ বার আল্লাহ 'রব' শব্দ এনেছেন।

দুনিয়ার অশান্তির মূল কারণ মানুষ মানুষের উপর 'রব' হয়ে চেপে বসা

অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে যুগেই মানুষ মানুষের উপর রব হয়ে চেপে বসেছে সেই যুগেই মানুষ ভোগ করেছে চরম নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার। যেমন দেখুন আরবে যতদিন পর্যন্ত আবু

www.pathagar.com

জেহেল ও আবু লাহাব গোষ্ঠীর হাতে একটা এলাকার পুরো প্রভূত্ব কায়েম ছিল, ততদিন পর্যন্ত মানুষ কেউ গড়েছিল অর্থের পাহাড়, কেউ হয়েছিল কেনা গোলাম। তখন হাটে বাজারে গরু-ছাগলের ন্যায় মানুষ বিক্রি হত। তখন সর্বহারা পুরুষেরা হতো দাস, মেয়েরা হতো দাসী। আর সামগ্রীকভাবে মেয়ে জাতিটাই ছিল পুরুষদের ভোগ্যপণ্যের ন্যায়। মেয়েদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে নামিয়ে এনে পশুত্বের মর্যাদা দেয়া হতো। তা ছাড়া এমন কোন অপকর্ম ছিল না যা তখন করা হতো না। এরপর যখনই সেখান হতে মানষরূপী রবগুলোর প্রভূত্ব খতম করে খোদায়ী প্রভূত্ব কায়েম করা হলো তখন সেখান থেকে বিদায় নিল যাবতীয় অশান্তি। মানুষ পেল মানুষের মর্যাদা, মেয়েরা পেল মাতৃত্বের ন্যায্য সম্মান। এভাবে ইতিহাসের যে অধ্যায়ের দিকেই লক্ষ্য করি না কেন দেখব যখনই কোন দেশের প্রধানগণ সে দেশের উপর রব হয়ে চেপে বসেছে তখনই সে দেশের জনগণ ঐ একই ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছে। তাই মানুষ যেন মানুষরূপী রবদের মেনে নিয়ে দুনিয়াতেও চরম নির্যাতন ভোগ না করে এবং পরকালেও জাহান্নামী না হয় সে জন্যে আল্লাহ বললেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ

অর্থাৎ "পরকালে যে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে সে যেন আমলে সালেহ করে (প্রত্যেকটি ভাল কাজকে আরবীতে আমলে সালেহ বলে) এবং সে যেন তার রবের হুকুম মানার ব্যাপারে অন্য কাউকে তার রবের সঙ্গে শরীক না করে।" (আল- কাহাফঃ ১১০)

অর্থাৎ যেখানেই আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে কোন মানুষের হুকুম বিরোধ সৃষ্টি করবে, সেখানেই মানুষের হুকুম না মেনে- তা সে মানুষ যে পর্যায়েরই হোক না কোন- একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মেনে চলবে। কারণ মানুষ কারও রব নয়, সবার রব আল্লাহ।

www.pathagar.com

আল্লাহকে কেন رَبّ বলে মানতে হবে?

যেহেতু আল্লাহকেই একমাত্র رَبّ হিসেবে মানার মধ্যেই রয়েছে মানুষেব মুক্তির পথ, তাই আসুন একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ও খোঁজ খবর নিয়ে দেখি যে কেন একমাত্র আল্লাহকেই রব হিসেবে মানতে হবে।

দেখুন, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সবকিছুকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে যে হাজারও ব্যবস্থাপনা রেখেছেন তার মধ্যে একটা হলো মায়ের দুধ। মানুষ যদি শুধুমাত্র এই দুধ তৈরীর বিষয়টি নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে তবে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু দুধ তৈরীর খোদায়ী রহস্য কেউ উদঘাটন করতে পারবে না। দেখুন যে শিরা উপশিরাগুলোতে দু'দিন পূর্বে লাল রং এর রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই শিরা উপশিরাগুলোই এক নির্দিষ্ট সময়ে সাদা রং-এর দুধে ভর্তি হয়ে পড়ে আর সেই দুধ যেন তার সন্তান পান করতে পারে সে জন্যে দুধের সমস্ত শিরাগুলোর মূল একই স্থানে এনে তা নির্দিষ্ট বহির্গমন শিরার সঙ্গে যোগ করে দেয়া হয়েছে এবং তা এমন কৌশলে যোগ করে দেয়া হয়েছে যে সন্তান মুখে চোষলেই দুধ তার গালের মধ্যে চলে আসবে। এ ছাড়াও দুধটা প্রথম দিকে থাকে অতি তরল ও লঘু পাক, যেন তার ছোট বাচ্চার পরিপাক যোগ্য হয়। অতঃপর সন্তান যতই বড় হ'তে থাকে ততই তার পাকস্থলিকে সবল করে গড়ে তোলার জন্যে তার একমাত্র খাদ্য দুধকে ক্রমেই গাড় করে দেয়া হয়। এতে পাকস্থলিও ক্রমে ক্রমে সবল হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর ব্যবস্থাপনা এত সুক্ষ্ম যে, মানুষ চিন্তা করলে আপছে মানুষের মাথা নত হয়ে আসবে। যেমন, লক্ষ্য করুন, এক বারের এক ঘটনার দিকে। একদিন হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে বিচারপতি হযরত আলী (রাঃ)-এর এজলাসে এক নালিশ এল। একই ঘরে একই সময়ে দু'জন নারী দু'টো সন্তান প্রসব করেছে, যার একটা ছিল কন্যা অপরটা ছিল পুত্র। কন্যা সন্তানওয়ালি তার মেয়েটিকে সংগোপনে পুত্র সন্তানের সঙ্গে বদল করে ফেলেছে যা তার মা টের পায়নি। কিন্তু পরে তার (কন্যার) চেহারা ছবি দেখে পুত্র সন্তানের মা অভিযোগ করল যে, আমার ছেলেকে তুমি বদল করে নিয়েছ। শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

এর জন্যে মামলা দায়ের হলো। বিচার গেল হযরত আলী (রাঃ)-এর এজলাসে। তিনি উভয়ের স্তনের দুধ নিয়ে পরীক্ষা করে বলে দিলেন সন্তান সত্যই তারা বদল করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন হযরত আলী (রাঃ)-কে যে, তুমি কি করে বিচার করলে? জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহ বলেছেনঃ মিরাসী ভাগ্যের বেলায়- "মেয়ের ২ গুণ ছেলে পাবে"। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছেলে সন্তানের জন্য দুধও হবে মেয়ে সন্তানের দুধের ২ গুণ গাঢ়। আল্লাহর এই ইঙ্গিত অনুযায়ী দুধ পরীক্ষা করে যার দুধ গাঢ় তাকে পুত্র সন্তান দিয়েছে এবং যার দুধ পাতলা তাকে কন্যা সন্তান দিয়েছে। এবার চিন্তা করুন আল্লাহ কেমন রব। শুধু কি এখানেই শেষ? না, আরও আছে। দুধ ছাড়াও যে আরও কিছু ব্যবস্থা এর সঙ্গে রয়েছে সে সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এর সঙ্গে আরও যে ব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে মায়ের অন্তরে ভালোবাসা বা মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেয়া। দেখুন, যে মা-ই একদিন অন্যের সন্তানের প্রস্রাব-পায়খানা দেখে নাক শিটকাতো ও ঘৃণায় দূরে সরে যেতো সে মায়েরই মন আল্লাহ এমন করে দেন যে, শুধুমাত্র নিজের সন্তানের প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার বেলায় মা সম্পূর্ণ মেথুরানী স্বভাবের হয়ে পড়েন এবং তাতে তার বিন্দুমাত্রও অস্বস্তি বোধ হয় না। এটা কেন? এ হচ্ছে শুধু আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের একটা কৌশল মাত্র যে কৌশলের মাধ্যমে তিনি তাঁর ছোট বান্দাদের মানুষ করে নেন।

পিতা-মাতার মধ্যে যে মুহাব্বত, ওটাও শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের প্রতিপালন করার জন্যে আল্লাহর একটা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কৌশলের মাধ্যমে দেখুন কি ভাবে পিতামাতাকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতিপালন করিয়ে নিচ্ছেন অথচ পিতামাতা মনে করছেন ওটা তাদের দায়িত্ব। শুধু দায়িত্বই মনে করেন না বরং পিতা-মাতা জ্ঞানের অগোচরে মনের টানে তাদের সন্তানদের লালন-পালন করে যাচ্ছেন। সারাটি জীবন পিতা-মাতা অমানুষিক পরিশ্রম করেন কিন্তু এ কথা টের পান না যে তাকে দিয়ে আল্লাহ তার ছোট বান্দাদের মানুষ করিয়ে নিচ্ছেন।

এবার আসুন আরও একটা বিষয়ের উপর চিন্তা করি। দেখুন হাঁস-মুরগীসহ যাবতীয় পাখিগুলো ডিম পাড়ে এবং তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত

www.pathagar.com

তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। ডিম দেয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরগীগুলোর শরীরে আল্লাহ এক প্রকার আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি করে দেন যে বাইরে সে বেরুতেই পারে না। সে তার জ্ঞানের অগোচরে চলে যায় ডিমের উপর এবং তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা দিতে থাকে। অথচ অন্য সময় এক সেকেন্ডের জন্যেও একটা মুরগীকে দিয়ে ঐভাবে তা দেয়ান যায় না। এটাও হচ্ছে রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহর আরও একটি কৌশল। এভাবে কত যে হেকমতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেছেন তা মানুষের সাধ্য কি যে বুঝে উঠতে পারে?

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তা তো মোটা চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু এমনও কোটি কোটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে আল্লাহর রবুবিয়তের দায়িত্ব পালনের জন্যে যা সবার চোখে ধরা পড়ে না। যেমন মানুষের দেহভ্যন্তরে কত হাজারও ব্যবস্থা চালু রয়েছে মানুষকে প্রতিপালনের জন্যে যার কিছু খোঁজ রাখেন ডাক্তারগণ। ঠিক তেমন অন্যান্য বিষয়ের কিছু খোঁজ রাখেন বিজ্ঞানীগণ, কিছুর খোঁজ রাখেন জ্যোতির্বিদগণ আর কিছুর খোঁজ রাখেন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ।

আমাদের সাধারণ খাদ্য

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে দেখি দু'টো চাউল রান্না করলেই তা ভাত হয়ে যায়। মনে হয় এ যেন কতই সহজ কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাতটা কি অত সহজে পাওয়া যায়? না, তা যায় না। ভাত পেতে হলে কমপক্ষে (১) চাউল (২) হাড়ি পাতিল বা যে কোন পাত্র (৩) পানি (৪) আগুণের তাপ (৫) একজন ব্যবস্থাপক এই ক'টা জিনিস লাগেই। এবার চিন্তা করে দেখা যাক এর একটা জিনিস কত সহজে পাওয়া সম্ভব। দেখুন, চাউল পেতে হলে প্রথমে জমিতে ধান ফলাতে হবে, সে জন্যে প্রয়োজন হবে। ১. জমি ২. উপযুক্ত চাষ ৩. সার ৪. বীজ ৫. বায়ু ৬. পানি ৭. সূর্যের কিরণ। এ ছাড়াও আরও বহু প্রকার খোদায়ী ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে একমাত্র এই ধরনের আবাদের পিছনেই। এবার চিন্তা করুন, আল্লাহ তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্যে শুধুমাত্র এই ধানের পিছনে কত প্রকার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

রেখেছেন। যার মধ্যে সূর্যের কিরণও রয়েছে যা বিহনে ধান ফলতে পারে না। সে সূর্য কি মানুষ নিজেরা তৈরী করে নিতে পারবে? তাছাড়া এ ধানের খাদ্য দিয়ে কি ভাবে আকাশ থেকে পানি নাযিল হচ্ছে তা কি আমরা কখনও চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। আল্লাহ এক বিশেষ নিয়মে সমুদ্রের নোনা পানির ভিতর থেকে পানি বাষ্পাকারে তুলে নেন। তারপর বায়ুকে উত্তপ্ত করে সম্প্রসারিত করেন। বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা এনে দেন; তারপর সেই বায়ুকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় উর্ধ্বে তুলে নেন। সেখানেও এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুকে ঠাণ্ডা করেন। বায়ু সংকুচিত হয়। জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেয় ফলে মেঘ হয়। বায়ু আরও সংকুচিত হয়। পানির কণাগুলোকে একে অপরের আরও নিকটবর্তী করে দেন যেন কতগুলো কণা একত্রে মিশে একটা পানির ফোঁটা তৈরী হতে পারে। এর পরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে সেই পানির ফোটাগুলোকে যমীনে পৌছে দেন। শুধু তাই নয় বিদ্যুৎ চমকানো, মেঘের ডাক, ঝড় তুফান ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৃষ্টির পানির সঙ্গে মহাশূন্যে রক্ষিত কোটি কোটি টাকা মূল্যের নাইট্রিক এসিড-যা গাছের খাদ্য-পানির সঙ্গে মিশিয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো, যেন বৃষ্টির পানির সঙ্গে গাছ তার উপযুক্ত ও পরিমিত খাদ্যও পেতে পারে। এসব ব্যবস্থাপনা কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? তাই আল্লাহ বলেন, "পারবে কি তোমরা আমার মত করে মেঘ তৈরী করে তার থেকে বৃষ্টি নামাতে? না কি আমিই তা করে থাকি? আমি ইচ্ছা করলে নোনা পানির সমুদ্র থেকে নোনা পানিই বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে তা দিয়ে নোনা পানির মেঘ সৃষ্টি করে নোনা পানিই বর্ষাতে পারতাম। তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে বলে তা আমি করি না, তা সত্ত্বেও তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর না।" (সূরা ওয়াকেয়া)

এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যার মধ্যে বলা হয়েছে কত হাজারও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকেন। এবার চিন্তা করুন এত সব ব্যবস্থা যদি মানুষকে করে নিতে হত তাহলে তা কি মানুষের দ্বারা কখনও সম্ভব হত? এসব যার দ্বারা সম্ভব একমাত্র তিনি পারেন رب হতে। এবার পুনঃ কিছুটা চিন্তা করে দেখুন, এক সের চাউল যা বাজারে গিয়ে ১২/১৩ টাকা মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে আসি তার মূল্য

www.pathagar.com

কি প্রকৃতই ১২/১৩ টাকা? যদি তার তৈরীর ব্যাপারে খোদায়ী ব্যবস্থাপনা কার্যকর না থাকত তবে ১২/১৩ টাকাতো দূরের কথা ১২/১৩টা পৃথিবীর মূল্য দিয়েও কি তা পাওয়া যেত? কিন্তু আল্লাহ যেহেতু رَبّ তাই তিনি তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে দেখুন কত হাজারও ব্যবস্থা রেখেছেন আকাশে, আর কত হাজারও ব্যবস্থা রেখেছেন যমীনে। এসব বিষয়ের উপর মানুষ তার জিন্দিগীভরও যদি চিন্তা-ভাবনা করে তবুও কি সে তা বুঝে কুল করতে পারবে? তা পারবে না। তাই মানুষ যদি বিশ্ব জাহানের দিকে লক্ষ্য করে, চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে সে দেখবে যে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর গোটা সৃষ্টিকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে এসব কথা যারাই চিন্তা করবে, আল্লাহ বলেন–

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا হে আমাদের رَبّ বা প্রতিপালক বাদশাহ। তুমি এ বিশ্বের কিছুই অযথা বা বিনা কারণে সৃষ্টি করনি। সবই আমাদের উপকারের বা প্রতিপালনের জন্যে সৃষ্টি করেছ।

ভাত পাওয়া যায় কি করে সেই আলোচনা করতে গিয়েই এত কিছু কথা বলা হলো। কিন্তু এখনও ভাত রান্না করার জ্বালানি কাঠ ও আগুনের কথা বলা হয়নি। এ সম্পর্কেও আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সূরা ওয়াকেয়ার মধ্যে বলেছেনঃ

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ـ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ـ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা যে আগুন দিয়ে রান্না কর তার দিকে কি লক্ষ্য করে দেখেছ? তোমরা কি জ্বালানি কাঠের গাছ নিজেরা তৈরী করে নিতে পার, না আমি তা সৃষ্টি করি? আমিই এসব সৃষ্টি করেছি যার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে ভুক্তভোগীরা বা যাদের প্রয়োজন তারা।" দেখুন এ প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের আরেকটি কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে সূরা হিজর এর ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ - وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ -

অর্থাৎ সব কিছুরই ভাণ্ডার আল্লাহর নিকট। তিনি যখন যা যে পরিমাণ প্রয়োজন তখন তা সেই পরিমাণ দেন এবং তা দিয়েই তিনি তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। দেখুন জ্বালানি কাঠের বেলায় এ কথাটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কেমন কাঁটায় কাঁটায় পালন করেছেন। যখনই আমাদের কাঠের অভাব দেখা দিয়েছে তখনই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের তিতাস গ্যাসের সন্ধান মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ কি এমনিতেই রাব্বুল আ'লামীন?

পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহর রবুবিয়াতের ব্যবস্থাপনা

আল্লাহ কিভাবে তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করেন তা যতই চিন্তা করা যাবে ততই মগজে ভেসে উঠবে আল্লাহর কত লক্ষ কোটি সুমহান ব্যবস্থাপনা। যেমন দেখুন আল্লাহ যেহেতু পৃথিবীর এক এক এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থা এক এক বিশেষ ধরনের করে গড়েছেন তাই পৃথিবীর প্রতিটি এলাকার প্রাণীই যেন তার অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারে সে ধরনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাই আল্লাহ করেছেন। যেমন অত্যন্ত কড়া শীতের মধ্যে যাদের জীবন-যাপন করতে হয় তাদের জন্যে সেখানে এমন সব ব্যবস্থা রেখেছেন যেন সেখানে তারা বাস করতে পারে। কাজেই সে ধরনের অঞ্চলের খাদ্য গাছ-পালা জীব জানোয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সবই তাদের জীবন ধারনের অনুকূলে। শুধু তাই নয় লক্ষ্য করলে আরও দেখতে পাওয়া যায় আমরা আমাদের এই দেশেই বিভিন্ন ঋতুতে যে বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি পাই, তাও প্রত্যেক ঋতুর আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ার মতই পেয়ে থাকি।

www.pathagar.com

যেমন গ্রীষ্মকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্যে ঠিক যে ধরনের খাদ্য দরকার তখন সে ধরনের উপযোগী ফলমূলের ব্যবস্থাই আল্লাহ করেছেন। যেমন ঐ সময়ে বাঙ্গি, তরমুজ, শশা ইত্যাদি ধরনের ফলমূল স্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজন বলেই আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক তেমনই যে মৌসুমে কমলা লেবুর প্রয়োজন ঠিক সেই মৌসুমেই তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে যে মৌসুমেই যে সব তরী তরকারী ও ফলমূল পাওয়া যায় তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেই মৌসুমের জন্যে দেহের চাহিদা মেটাতে ঠিক যে ধরনের উপাদান দরকার ছিল ঠিক সে ধরনের উপাদানই রয়েছে তখনকার উৎপাদিত ফল মূলেল মধ্যে। এছাড়াও আমরা সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব আল্লাহ তাঁর প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে রেখেছেন পৃথিবীর সর্বত্র একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মত। যেমন বাংলাদেশকে আল্লাহ দিয়েছেন কৃষি সম্পদ, খনিজ ও গ্যাস সম্পদ। তেমন আরব দেশকে কৃষি সম্পদ দেননি বলেই তৈল সম্পদে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলেছেন। তাছাড়া দেখুন চীন, জাপান, ভারত, সাইবেরিয়া ও কোরিয়াকে আল্লাহ দিয়েছে লৌহ ও কয়লা সম্পদ। কুয়েত, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, সাইবেরিয়া, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও পাকিস্তানকে আল্লাহ দিয়েছেন কিছু কম বেশী খনিজ তৈল সম্পদ। মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ও ইন্দোচীনকে আল্লাহ দিয়েছেন টিন সম্পদ। সাইবেরিয়া কোরিয়া ও ফিলিপাইনকে আল্লাহ দিয়েছেন স্বর্ণ সম্পদ। তেমন জাপান, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়াকে আল্লাহ কিছু রৌপ্য সম্পদও দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন সম্পদ দিয়ে আল্লাহ সম্পদের একটা ভারসাম্য রক্ষা করেছেন যেন পৃথিবীর কোন দেশ বা কোন মহাদেশ একে অপরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহর যে কোন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তিনি যথাযথ ভাবেই তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

অতঃপর আমি মনে করি যিনিই এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা -ভাবনা করবেন তাঁরই মগজে ধরা পড়বে আল্লাহর রবুবিয়াতের ব্যবস্থাপনা কত নিখুঁত এবং যিনিই জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখবেন তিনিই দেখতে পাবেন এ বিশ্বের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে

www.pathagar.com

رَبُّنَا اللّٰهُ -رَبُّنَا اللّٰهُ رَبُّنَا اللّٰهُ বা আল্লাহই আমাদের রব। আর যিনি মনের কান দিয়ে শুনবেন তিনি শুনতে পাবেন যেন পৃথিবীর প্রতিটি অনুপরমাণু ঘোষণা করছে

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى -

বা ত্রুটি মুক্ত পবিত্র রবই আমার শ্রেষ্ঠ রব।

এসব দেখতে, শুনতে ও বুঝতে প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র মনকে নিরপেক্ষ করে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। বরং আমার বিশ্বাস যিনি যত বেশী চিন্তা-ভাবনা করবেন তিনিই তত বেশী বুঝতে সক্ষম হবেন যে আল্লাহ কেমন রব।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'রব' বুঝার চেষ্টা করেছি এবার আসুন 'আ'লামীন' বুঝার চেষ্টা করি।

عٰلَمِيْن (জগৎ সমূহ)

আমরা এক কথায় বলি জগৎসমূহ কিন্তু, কতটুকু নিয়ে জগৎ সমূহ তা-কি আমরা বুঝি? দেখুন একটা মুরগীর বাচ্চা এ পৃথিবীকে যতটুকু বড় মনে করে একটা উড়ন্ত কবুতর নিশ্চয়ই এ পৃথিবীকে তার চাইতে কিছুটা বেশী বড় মনে করে। কিন্তু শকুন যে বহু উপর দিয়ে উড়ে, সে পৃথিবীটাকে অবশ্যই কবুতরের চাইতে কিছুটা বড় দেখে। তাই বলে একটা মানুষ পৃথিবীটাকে যত বড় আকারে দেখতে পারে একটা শকুন তা অবশ্যই দেখতে পারে না। ঠিক তেমনই ভাবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে عٰلَمِيْن মানে যা বুঝি প্রকৃত عٰلَمِيْن ততটুকু নয়; তার চাইতে অনেক বেশী। যেমন ১টা মুরগীর বাচ্চা পৃথিবীটাকে যতটুকু মনে করে প্রকৃত পৃথিবী তার চাইতে বহু বহু গুনে বড়। এ সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে সূরা তালাকের শেষ আয়াতে। যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ -يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا --الطلاق-٢١

www.pathagar.com

আল্লাহ তো তিনিই যিনি ৭টি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরুপ কিছু পৃথিবীও (সৃষ্টি করেছেন)। সে সব পৃথিবীতে তিনি অহি নাযিল করে থাকেন (একথা তোমাদেরকে এই জন্যে বলা হলো) যেন তোমরা বুঝতে পার যে আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান এবং (এ কথাও যেন তোমরা বুঝতে পার যে) অবশ্য আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। আরবীতে مِنْ সাধারণতঃ 'হইতে' অর্থ দেয়। কিন্তু কোন কোন স্থানে مِنْ অর্থ 'কিছু'। এখানে مِنْ থেকে কিছু বুঝতে হবে। যে مِنْ কিছুর অর্থ দেয় সে مِنْ কে আরবীতে مِنْ بَعْضِيَّةْ বলে। কিছু পৃথিবী বললে পৃথিবী এক বচনের পরিবর্তে বহুবচন হয়ে যায় তাই مِنَ الْاَرْضِ এর সর্বনাম বহু বচনে هِنَّ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য কিছু মুফাসসির هُنَّ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল বুঝেছেন। কিন্তু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) هُنَّ থেকে বহু পৃথিবী বুঝেছেন। তাই তাঁর নিকট এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেছেন– আমার ভয় হচ্ছে যে এর ব্যাখ্যা বললে তোমরা বেঈমান না হয়ে পড়। অর্থাৎ বহু পৃথিবীর কথা বললে হয়ত তা (বহু পৃথিবীর কথা) তোমরা নাও মানতে পার। তিনি তাঁর তাফসীরের মধ্যে লিখেছেন (অবশ্য বিভিন্ন কিতাবে কথা ও ভাষার মধ্যে কিছু গরমিলও দেখা যায়)-

فِىْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِىٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاٰدَمُ كَاٰدَمِكُمْ وَنُوْحٌ كَنُوْحٍ وَاِبْرٰهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى كَعِيْسٰى -

অর্থাৎ প্রত্যেকটি পৃথিবীতে তোমাদের নবীর মত নবী আসেন, তোমাদের আদমের মত আদম, নুহের (আঃ) ন্যায় নুহ ও তোমাদের ঈসার (আঃ) ন্যায় ঈসা আসেন। কোন কোন বর্ণনায় আদম শব্দটা নাই।

আমাদের এ পৃথিবী ছাড়া যে আরও পৃথিবী আছে এ কথা বললে আজও অনেকের ঈমান যাওয়ার ভয় আছে। কারণ আজও বহু পৃথিবীর কথা শুনলে অনেকের নিকট তা অদ্ভুত বলে মনে হবে। কিন্তু আশা করা

www.pathagar.com

যাচ্ছে এ ভয় আর বেশী দিন পর্যন্ত করতে হবে না। কারণ সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন জ্যোতির্বিদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন যে আমাদের এ পৃথিবী যে ছায়াপথ বা Galaxy-তে অবস্থিত এই একই Galaxy-তে আমাদের এ পৃথিবীর ন্যায় প্রায় ৬০ কোটি গ্রহ-উপ-গ্রহ রয়েছে, যেগুলোর প্রাকৃতিক অবস্থা প্রায় আমাদের এ পৃথিবীর ন্যায়ই। তা ছাড়াও অসীম মহা ফাঁকার মধ্যে যে আরও কোটি কোটি গ্রহ-উপ-গ্রহ থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ সব কিছুকে নিয়েই আল্লাহর عٰلَمِيْنَ (আ'লামীন) আর সে সব কিছুর তিনিই একামত্র رَبّ বা প্রতিপালক।

৩নং শিক্ষা

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (দাতা দয়ালু)

উপরে যা কিছু আলোচনা হলো তাঁর পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কেন তার নাফরমান বান্দাদের প্রতিপালন করেন? তাদের প্রতিপালন না করলে তো মুহূর্তের মধ্যেই দুনিয়ার যত অশান্তি সবই দূর হয়ে যায়। এ প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর পরবর্তী শব্দদ্বয়। অর্থাৎ যেহেতু তিনি اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তাই তিনি তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করেন ফলে তাৎক্ষণিক ধ্বংস আমরা দেখি না। তিনি اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বা পরম দাতা দয়ালু না হলে অবশ্যই কাফের মুশরিকদের পতিপালক হতে পারতেন না। আল্লাহ যে বান্দার প্রতি কত দয়ালু তার ব্যাখ্যা দেয়ার দুঃসাহস কোন মানুষের থাকতে পারে না। আমারও এমন দুঃসাহস নেই যে আল্লাহ কেমন দয়ালু তার উপর কিছু লিখি। আমি শুধু মাত্র এক কথায় এতটুকু বলতে পারি যে আমরা যা-ই চোখ দিয়ে দেখি এবং যাই কিছু অনুভব করি ও উপভোগ করি তার সবটুকুই আল্লাহর দয়া আর আমাদের জ্ঞানে বাইরে যা রয়েছে অর্থাৎ যা এখনও আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়ছে না কিন্তু আছে, এমন সব কিছুই- আমি

www.pathagar.com

আরও অগ্রসর হয়ে বলব আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সবই- তাঁর পরম দয়ারই বহিঃপ্রকাশ। মানুষ লক্ষ্য করলে দেখবে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জোয়ার, ভাঁটা, আমাবশ্যা পূর্ণিমা, ঋতুর পরিবর্তন, দিন রাত, বায়ু, পানি, বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থ, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান, বিজলির চমক, মেঘের ডাক, পাহাড় পর্বত, ঘনবন, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা হরেক প্রকার গাছ-পালা, বহু ধরনের প্রাণী, নানা প্রকার শিলা, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, বহু প্রকার ধাতু, বিভিন্ন প্রকার ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শক্তি, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, এর কয়টার নাম করব? এভাবে সারা জীবন মানুষ যত প্রকার জিনিসের নাম করতে পারবে তার সবটুকুই আল্লাহর দয়া। আপনি চেয়ে দেখুন, কোন দিকে আপনার নজর পড়ছে? যার দিকেই নজর পড়ে তারই উপর চিন্তা করুন দেখবেন তারই গায়ে লেখা রয়েছে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। দেখুন রাস্তার দিকে তাকান, দেখছেন গরু-ছাগল বাঁধা রয়েছে আর কিছু হাঁস মুরগী চরছে। এবার বেশী নয় শুধু এই কয়টা জীবের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শনের নিমিত্তই ওগুলোর সৃষ্টি কিনা। দেখুন গাভীর প্রতি, আপনি তার দুধ খাবেন, তার গোশত খাবেন, তার হাঁড় দিয়ে সার তৈরী করবেন, তার মল মুত্র সারের কাজে ব্যবহার করবেন ও জ্বালানি তৈরী করবেন, চামড়া দিয়ে জুতা, সুটকেস, মানিব্যাগ ইত্যাদি ধরনের কত মূল্যবান জিনিস তৈরী করবেন। আর বকরি ও হাঁস মুরগীগুলো যারা শৃগালকে শত্রু ও আপনাকে বন্ধু মনে করে কিন্তু, শৃগালে তার ক'টা হাঁস মুরগী বধ করে আর আপনি তো তার সব ক'টাই জবাই করে খান তবুও তারা আপনাকে শত্রু মনে করে না ও আপনার ঘর ছেড়ে পালায় না। এটাও কি আল্লাহর দয়া নয়? এবার গাছের দিকে তাকান কোন গাছ দেখছেন? তাল গাছ? না নিম গাছ? না আর কোন গাছ যে গাছই দেখুন না কেন তা আপনার প্রতি দয়া করেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

৪নং শিক্ষা

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (বিচার বা প্রতিফল দিবসের মালিক) আল্লাহ যদি اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে আর কিছু না বলতেন তা'হলে মানুষ মনে করত 'যত পার কর পাপ আল্লাহ করিবেন মাফ'। কারণ তিনি রহীম ও রহমান। এই ধারণাকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন আমি اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ঠিকই কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে আমি مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ও বটে। অর্থাৎ পরকালের প্রতিফল দিবসের আমিই মালিক। সেদিন কারও মধ্যে কোন অপরাধ পাওয়া গেলে তাকে ছাড়া হবে না। তাকে তার প্রতিফল গ্রহণ করতে হবে।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর মধ্যে শব্দ মোটামুটি ৩টি। যথা- مٰلِكْ বা সত্ত্বাধিকারী বাদশাহ যিনি একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী। يَوْم বা দিন। আমরা যাকে দিন বলি তা হচ্ছে ২৪ ঘন্টার দিন। এ দুনিয়ার দিনকেও আরবীতে يَوْم (ইয়াওম) বলা হয় এবং আখেরাতের বিচার বা প্রতিফল গ্রহণের দিনকেও يَوْم বলা হয় কিন্তু সেই দিন আর এই দিনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এ হচ্ছে মাত্র ২৪ ঘন্টার একটা দিন। আর সে হবে হযরত আদম (আঃ) হতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করবে তাদের প্রত্যেকের চুলচেরা বিচার করতে যত সময় লাগবে তত সময় ধরে একটা দিন। যেখানে এক একজন মানুষের সারা জীবনের বিচারের জন্যে (কারও কারও ক্ষেত্রে হয়ত হাজার বৎসর সময়ও লেগে যেতে পারে। আর এভাবে প্রত্যেকের হিসেব নিতে যত সময় প্রয়োজন হবে তত সময় নিয়েই হবে সেই দিনটা)। دِيْن (দ্বীন) সাধারণতঃ ৪ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ যথা ঃ- ১। ধর্ম, আনুগত্য, প্রভূত্ব ২। জীবন ব্যবস্থা ৩। আইন কানুন ৪। প্রতিফল এখানে اَلدِّيْن অর্থ একমাত্র সঠিক প্রতিফল। তাহলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর অর্থ দাঁড়াল আল্লাহ কর্মফল দিবসের একমাত্র মালিক। যে দিন কারও পক্ষে কারও কোন ওকালতি খাটবে না সবাই ইয়া নাফসি ইয়া

www.pathagar.com

নাফসি করবে সেই দিনই মানুষ বুঝতে পারবে যে শেষ বিচার দিনের খেয়াল যাদের নেই আর সেদিনকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যারা এলোমেলো জীবন-যাপন করে তারা কত নির্বোধ।

যেহেতু رَبِّ এর ব্যাখ্যার পর مَالِكْ এর ব্যাখ্যা তাই এখানে مَالِكْ এর ব্যাখ্যা সংক্ষেপ করা হল।

৫নং শিক্ষা

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

(আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই) اِيَّاكَ একমাত্র তোমারই نَعْبُدُ আমরা দাসত্ব করি। وَ এবং اِيَّاكَ একমাত্র তোমারই نَسْتَعِيْنُ আমরা সাহায্য চাই। এর ভাবার্থ দাঁড়াল এই যে, আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমারই হুকুম মেনে চলি কাজেই সাহায্য যা চাওয়ার প্রয়োজন হয় তা তোমারই নিকট চাই। কারণ দাসত্ব করব একজনের আর যা প্রয়োজন হয় তা চাইব অন্যের নিকট, এটাও যেমন যুক্তি বিরোধী তেমন যা যখন দরকার তা চাইব এক সত্বার নিকট (আর তা সেই নির্দিষ্ট সত্বা ছাড়া আর কারও নিকট পাওয়াও যায় না কাজেই তারই নিকট চাই) আর দাসত্ব করব অন্যের এটাও তেমন যুক্তি বিরোধী। অতঃপর দেখা যাক مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর পরই কেন বলা হলো اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর কারণ এই যে, যারাই পরকালের বিচার ও প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হবে তাদেরই অন্তরে একটা ভয় পয়দা হবে যে তাহলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়টা কি? তখন তার মন থেকেই এ কথা বেরিয়ে আসবে যে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ হে আল্লাহ! আমরা তো তোমারই দাসত্ব করি এবং ভবিষ্যতেও তোমারই হুকুম মেনে চলব বা

www.pathagar.com

তোমারই দাসত্ব করব এবং আমাদের যা-ই কিছু প্রয়োজন হয় তা একমাত্র তোমারই নিকট চাই এবং ভবিষ্যতেও আমাদের যখন যা প্রয়োজন হবে তা তোমারই নিকট চাইব। আর আমরা যদি এভাবে সারা জীবন তোমারই দাসত্ব করি এবং যদি কোন ব্যাপারেই আর কারও দাসত্ব না করি এবং কখনও আর কারও হুকুম না মানি আর যদি কোন ব্যাপারেই দুনিয়ার কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে একমাত্র তোমারই মুখাপেক্ষী হই তাহলে তুমি مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ হওয়ায় আমাদের কোন ভয়ও নেই এবং কোন ক্ষতিও নেই।

نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ শব্দ দু'টি এভাবে পাশাপাশি আনার অর্থ হলো এই যে, যেহেতু চেয়ে পাওয়ার মধ্যেই রয়েছে দাসত্বের প্রবণতা। আর যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাস হওয়া বা অন্য কারও হুকুম মেনে চলার অর্থই হলো আল্লাহর ইবাদতের রাস্তা থেকে সরে শেরেকীর রাস্তায় পা বাড়ানো। আমরা মুসলমান জাতি যেহেতু বিশ্বাস করি যে, আমরা যা পাই, তা যার মাধ্যমেই পাই না কেন, প্রকৃত দেনেওয়ালা আল্লাহই। কাজেই যা চাওয়ার দরকার তা অন্যের নিকট চেয়ে তো লাভ নেই, তাই যিনিই মূল দাতা তারই নিকট চাইব। আর তা যার থেকে পাই, তারই হুকুম মেনে চলাটাই হচ্ছে যুক্তির দাবী। তাই একমাত্র তারই হুকুম মেনে চলব। হ্যাঁ, তবে মনে রাখতে হবে যে সাহায্য আল্লাহই করেন, কিন্তু করেন কিছু না কিছুর মাধ্যমে। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ মাধ্যমকেই প্রকৃত দাতা মনে করে এবং আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে ঐ সব মাধ্যমগুলোরই হুকুম মেনে চলে। ফলে তারা আর আল্লাহর দাস থাকে না দাস হয়ে পড়ে ঐসব সাহায্যদাতা মাধ্যমগুলোর। অর্থাৎ এক কথায় বলতে হবে যে তারা মানুষের দাস হয়ে পড়ে। এ আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষ সাহায্য চেয়ে যখনই মানুষের নিকট থেকে সাহায্য পায় তখনই তার সাহায্যদাতার হুকুম মেনে চলার মত একটা প্রবণতা তার মধ্যে পয়দা হয়। তাই এই দুষ্ট প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্যেই আল্লাহ বললেন, যেহেতু তোমরা সাহায্য পাওয়ার কারণেই সাহায্য দাতার দাসত্ব কর তাই সাহায্য চাও একমাত্র সেই রবের নিকট যিনি প্রকৃত সাহায্যদাতা। তাহলে প্রকৃত

www.pathagar.com

রবের দাসত্ব করতে পারবে। এই অনুভূতি মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে দেয়ার জন্যেই نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ শব্দ দু'টি পাশাপাশি আনা হয়েছে।

অবশ্য শব্দ দু'টিকে পাশাপাশি আনার ঐ একই কারণ অন্য ভাবেও প্রকাশ করা যায়। তা হচ্ছে এরূপ যে 'মানুষ যারই দাসত্ব করে তারই নিকট সাহায্য চায়।' অর্থাৎ মানুষ যখন মানুষের দাসত্ব করে তখন সে মানুষের নিকটই সাহায্য চায়। কিন্তু, কেউ যদি মানুষের দাসত্ব বর্জন করে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করে, তবে সে যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব করে কাজেই সে আল্লাহরই নিকট সাহায্য চায় এবং তারই সে মুখাপেক্ষী থাকে। সে দুনিয়ার কোন বড় শক্তিরই মুখাপেক্ষী হয় না। এ কারণেই نَعْبُدُ শব্দের কেবলই পারে نَسْتَعِيْنُ শব্দ আনা হয়েছে যেন মানুষের মনে এ অনুভূতি সর্বদাই জাগ্রত থাকে যে মুখাপেক্ষি হব যে আল্লাহর দাসত্বও করব সেই আল্লাহর।

نَعْبُدُ শব্দের তাৎপর্য

نَعْبُدُ শব্দের মধ্যে আরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে তা হচ্ছে এই যে আমরা প্রত্যহ ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযে কম করে হলেও ৪০ বার বলি نَعْبُدُ বা হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করি। কিন্তু, আমরা কি সত্যই বুঝি যে দাসত্ব করি কথাটার তাৎপর্য কি? দেখুন আল্লাহর হুকুম মেনে চললেই আল্লাহর দাসত্ব করা হয় একথাটা বলা যত সহজ এর আসল তাৎপর্য অনুধাবন করা তত সহজ নয়।

আল্লাহর হুকুম সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা- ১. এমন হুকুম যা মানলে বা মানতে গেলে কারও স্বার্থে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না এবং কারও হুকুমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় না সাধারণতঃ এই ধরনের হুকুমগুলো আমরা মানি ও মানতে পারি। ২নং এমন কিছু আল্লাহর হুকুম রয়েছে যা মানতে গেলে কারও না কারও স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে এবং কারও না কারও হুকুমের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করবে। দেখা যায় এই ধরনের হুকুমগুলো

www.pathagar.com

আমরা মানি না কারণ তা মানার মত কোন পরিবেশ এ সমাজে নেই। যেমন আল্লাহ যতবার বলেছেন নামায পড় ততবার বলেছেন যাকাত দাও। কিন্তু, যেহেতু নামায পড়তে স্বার্থ হানির কোন কিছু নেই তাই নামাযে অনেকেই অভ্যস্ত কিন্তু যেহেতু যাকাত দিতে গেলে স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পকেট থেকে টাকা বের করতে হয় তাই যত লোক নামায ফরজ হওয়ার কারণে নামায পড়ে তত লোক যাকাত ফরজ হওয়ার কারণে যাকাত দেয় না। ঠিক তেমনই ভাবে সুদ, ঘুষ, যৌতুক ইত্যাদি ধরনের অনেক কিছুই হারাম হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তা লোভনীয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত তাই নামায পড়েও অনেকে ঐসব অবৈধ কার্যকলাপ ত্যাগ করতে পারে না। এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম কোন শক্তি ধরদের হুকুমের মধ্যে বিপরীত মুখী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে অনেকেই শক্তিধরদের হুকুম মেনে চলে। যেমন আল্লাহর হুকুম হলো সমাজে সুদ থাকতে পারবে না, সেখানে শক্তিধরদের হুকুম হলো সুদ থাকতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে একই ব্যাপারে যখন মানুষ দুই বিপরীতমুখী হুকুমের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের অনেকেই আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে শক্তিধরদের হুকুমকেই মেনে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব করা হয় না, দাসত্ব করা হয় তার যার আইন মেনে চলে।

তাই মানুষ যতই বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হউক না কেন সে যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব না করে এবং আল্লাহর বান্দা হয়ে যেন আর কারও মুখাপেক্ষী না হয় সেই অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যেই نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর বান্দা হ'তে হলে সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মানতে হবে। তাহলেই مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, নইলে নয়। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানার পথে বিরাট ধরনের বাঁধা সৃষ্টি হয়। তখন যেন হাজার বাঁধার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এবং মার ধর খেতে হলেও কিংবা জান-মাল সব কিছু বিসর্জন করে হলেও যেন আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোন হুকুম না মানি

www.pathagar.com

সে শিক্ষাও রয়েছে نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ শব্দদ্বয়ের মধ্যে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলো বুঝানোর জন্যে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যার থেকে বুঝতে সহজ হবে যে কোন কোন ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম পালন করা কষ্টকর। দেখুন আমরা প্রত্যহ যখন কম করে হলেও অন্ততঃ ৪০ বার আল্লাহকে বলি যে اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা তোমারই দাসত্ব করি, সেখানে আমরা সত্যই কি বুঝি যে দাসত্ব করার অর্থ কি? দাস হলে তাকে অবশ্যই দাস স্বভাবের হতে হবে। যেমন মনে করুন কোন ব্যক্তি ১০ জন চাকর রাখল। তাদেরকে বলল, তোমরা আমার অমুক জমিটা চাষ করবে। সেখানে গমের আবাদ করব, আমি তোমাদের জন্যে সেখানেই থাকা খাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা করব এবং উপযুক্ত বেতন দেব। চাকরগুলো সেখানে গিয়ে যদি দেখে যে তার মালিকের জমি অন্য কেউ জোর করে দখল করে সেখানে তামাকের চারা লাগিয়েছে। ওরা (চাকরগুলো) সেখানে হাল চাষ করতে গেলে বেদখলকারী যদি ধমক দিয়ে বলে 'হাল গরু রাখ এবং আমার সঙ্গে আমার লাগানো তামাকের চারার গোড়ায় পানি ঢাল, চাকরগুলো যদি তাই করা শুরু করে, তবে তাতে প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব করা হয় কার? তাদের মূল মালিকের না বেদখলকারীর? এ প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেকেই বলবে তাদের (চাকরদের) দাসত্ব মূল মালিকের হয় না, হয় বেদখল কারীর। ঠিক তেমনই আমরা যদি প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে মূল মালিকের হুকুমের পরিবর্তে আল্লাহর জমিনে বেদখলকারীর হুকুম মেনে চলি অর্থাৎ আল্লাহ বললেন, 'চুরি করলে তার হাত কেটে দাও' যদি সেখানে আমরা বেদখল কারীর হুকুম মত চুরির উত্তম ট্রেনিং লাভের জন্যে বড় বড় চোরদের সঙ্গে ৬ মাস জেলখানার ট্রেনিং ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করি, এভাবে আল্লাহ বললেন, সুদ হারাম সেখানে আমি সারা জীবন সুদের হিসাব করি এবং যা বেতন পাই তা দিয়েই সংসার চালাই, হজ্জ করি, যাকাত দেই ইত্যাদি নেক কাজ করি। আল্লাহ বললেন, যেনার শাস্তি স্বরূপ রজম কর কিংবা ১০০ দোর্রা মার এভাবে আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে যেখানেই বেদখলকারীর হুকুম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সেখানেই বেদখলকারীর হুকুম যদি মানি তাহলে কি اِيَّاكَ نَعْبُدُ বলে আল্লাহর নিকট যা স্বীকার করি তা

www.pathagar.com

বাস্তবে পালন করা হয়? তা কস্মিনকালেও হয় না। সত্যিকারের মূল মালিকের হুকুম মত যদি ঐ চাকরগুলো বেদখলকারীদের তামাকের চারা শিকড় সমেত তুলে ফেলে দিত তবেই তার মূল মালিকের হুকুম মানা হত। হ্যাঁ তবে তা করতে গেলে তাদের (ঐ চাকরদের) অবশ্যই সংঘর্ষের সম্মুখীন হ'তে হত। তাদের মার ধরও খেতে হত। কিন্তু তারা যদি মূল মালিকের হুকুম মানতে গিয়ে মার খেত তবে মূল মালিক কি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতেন? তা কিছুতেই দেখতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তার চাকরদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। এতে কিছু মার ধর খেতে হলেও মূল মালিকের দাসত্ব করা হতো এবং মূল মালিকের বেতন পাওয়া যেতো কিন্তু, বেদখলকারীর হুকুম মত তামাকের চারার গোড়ায় পানি ঢাললে তাতে মূল মালিকের নিকট কিছু পাওনা হয় না। এ দুই ক্ষেত্রে আল্লাহর বান্দাদের কি করতে হবে তা বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ তারা (আল্লাহর বান্দারা) তাদের রবের দাসত্ব করার ক্ষেত্রে যেন অন্য কাউকে (তোমাদের রবের সঙ্গে) শরীক করে না বসে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে যারই হুকুম বিরোধ সৃষ্টি করবে তারই হুকুম যেন না মানে এবং সব ক্ষেত্রেই যেন একই আল্লাহর হুকুম মেনে চলে। চিন্তা করুন আমরা যারা প্রত্যহ কমপক্ষে ৪০ বার আল্লাহর নিকট ওয়াদা করি আমরা সামগ্রিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তোমারই হুকুম মেনে চলব। সেখানে যদি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করে তার খেলাফ করি এবং যদি বেদখলকারীর হুকুম মেনে চলি তা'হলে কি আল্লাহর সঙ্গে মুনাফেকী করা হয় না? আর এতেই কি مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে?

এখন প্রশ্ন, তা'হলে বেদখলকারীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়টা কি? তার জবাব হচ্ছে জিহাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ তৈরী করা; যেন আল্লাহর হুকুম মানতে পারার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেমন জিহাদ করে হুজুর (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে পুরোপুরিই আল্লাহর হুকুম মেনে চলা সম্ভবপর হয়েছিল। বরং আল্লাহর হুকুমের খেলাফ চলাই সে সমাজে অসম্ভব ছিল।

www.pathagar.com

৬নং শিক্ষা

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (দেখাও আমাদের সরল-সোজা পথ) اِهْدِ দেখাও [আরবীতে 'চোখে দেখাও' বুঝতে হলে اَرِنِىْ শব্দ ব্যবহার করা হয় আর জীবন-যাপনের পথ 'দেখাও' বলতে হলে اِهْدِ বলতে হয়] اِهْدِنَا দেখাও আমাদিগকে। اَلصِّرَاطُ একমাত্র রাস্তা। اَلْمُسْتَقِيْم একমাত্র সঠিক।

পূর্ববর্তী আয়াতে আমরা যখন نَعْبُدُ বলে আল্লাহর নিকট শপথ গ্রহণ করেছি যে হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করবো। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এটা জানার যে কোন পথে চললে তাঁর পুরো দাসত্ব করা হবে। অতঃপর যখনই তার মনে প্রবল আকাংখা সৃষ্টি হবে আল্লাহর দাসত্ব করার পথ চেনার; তখনই সে বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে এই কথা বলে যে হে আল্লাহ তুমি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (সরল সোজা পথ দেখাও) এবং এই সিরাতের বা রাস্তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য বলা হলো নিম্নের অংশটুকু।

৭ নং শিক্ষা

আমাদেরকে সেই সরল সোজা পথ দেখাও। صِرَاطَ الَّذِيْنَ যে পথে (চলার কারণে পূর্ব যামানার কিছু লোককে) اَنْعَمْتَ তুমি নেয়ামত দান করেছিলে عَلَيْهِمْ তাদের উপর। যে পথ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ বা অগজবের পথ এবং وَلَا الضَّآلِّيْنَ বা অগোমরাহীর পথ। অর্থাৎ যা অভিশপ্ত ইহুদী ও পথভ্রষ্ট নাসারাদের পথ নয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে صِرَاطَ শব্দের পূর্বেও ال শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং مُسْتَقِيْم শব্দের পূর্বেও ال শব্দ যোগ করা হয়েছে। ফলে

www.pathagar.com

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর অর্থ দাঁড়ালো 'একমাত্র পথ বা একমাত্র সঠিক।' এখন প্রশ্ন এ পথটা চিনব কি করে? এরই জবাবে বলা হয়েছে সে পথটা হচ্ছে তাদের পথ যাদেরকে আল্লাহ সবচাইতে বড় নেয়ামত দান করে ছিলেন। আর সব চাইতে বড় নেয়ামত হলো 'নবুয়তি লাভ'। তা'হলে প্রমাণ হলো নবী রাসূলগণের পথই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ যে পথে চললে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে। অতঃপর পুনরায় একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যা খুবই গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিরপেক্ষ মনে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, আমাদের সামনে এখন নবী রাসূল নেই, আছেন শুধু আল্লাহর কিছু খাস বান্দা যারা মুসলমানদেরকে বেহেশ্‌তের পথ দেখানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং মুসলমানগণ তাদের অনুসারীও বটে। আর তাঁরা (যারা পথ দেখানোর কাজে নিয়োজিত) হচ্ছেন কেউ পীর, কেউ সুফী, কেউ দরবেশ কেউ মুরব্বি ইত্যাদি বিভিন্ন নামের পথ প্রদর্শক। তারা প্রত্যেকেই দাবী করেন যে আমার পথই একমাত্র সঠিক পথ। তাদের যারা অনুসারী তাঁদেরও দাবী যে আমাদের হুজুরের দেখানো পথই একমাত্র সঠিক পথ। কিন্তু, দেখা যায় এক হুজুরের পথ থেকে অন্য হুজুরের পথের মধ্যে কিছু না কিছু ব্যবধান আছেই। ফলে পথগুলো যেহেতু কিছুটা (তা যত সামান্যই হোক) গরমিলের, তাই তাদের অনুসারীদেরকে লোক বিভিন্ন পন্থী বলে ডাকে, যেমন আমাদের বাংলাদেশের দ্বীনদার মুসলমানদের কেউ ফুরফুরা পন্থী, কেউ চরমোনাই পন্থী, কেউ আটরশি পন্থী, কেউ তাবলীগ পন্থী, কেউ এ পন্থী, কেউ সে পন্থী এভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমান যে কত পন্থীতে বিভক্ত তার কোন লেখা জোখা নেই। কিন্তু প্রশ্ন, তা'হলে মুসলমান সবই তো বিভিন্ন পন্থীতে বিভক্ত হয়ে গেলাম, এখন নবী পন্থী হবে কারা? অর্থাৎ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ থেকে যে নবী রাসূলগণের পথকেই একমাত্র বেহেশ্‌তের পথ বলা হয়েছে সেই পথের অনুসারী হতে হলে তা পরিষ্কার নবী পন্থীই হতে হবে। কিন্তু সে পন্থী হিসেবে এখন কাদের ধরব? তা ধরার পন্থা হলো; দেখতে হবে হুবহু হুজুরে পাক (সঃ)-এর জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের সঙ্গে কোন পন্থীর পুরোপুরি কাঁটায় কাঁটায় মিল

www.pathagar.com

রয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় রাসূল (সঃ)-এর রাতের বেলার ইবাদতের সঙ্গে অনেকেরই কিছু কিছু মিল আছে কিন্তু দিনের বেলার কাজের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি দিনের বেলা ইসলামী আন্দোলন করেছেন, হেজবুল্লাহর দল গঠন করেছেন, তাদের যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছেন, জিহাদ করেছেন। ইসলামী খেলাফত কায়েম করেছেন। আর রাতে মগ্ন হয়েছেন আল্লাহর ধ্যানে। এসব কাজ কি আমাদের জন্যে মা'ফ হয়ে গেল।

اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ এর ২য় ব্যাখ্যা

এখন লক্ষণীয় যে صراط অর্থ পথ তার পূর্বে ال শব্দ যোগ করায় অর্থ দাঁড়াল একমাত্র নির্দিষ্ট পথ। যে পথ ধরে চললে তার সামনে বেহেশ্‌ত রয়েছে। আর সে পথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলেই আর বেহেশ্‌তে পৌছা যাবে না। এখানে লক্ষণীয় যে মুস্তাকিম مُسْتَقِيْم বা সঠিক শব্দের পূর্বেও ال শব্দ জুড়ে সঠিক শব্দটাকেও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, ফলে এর অর্থ দাঁড়াল শুধুমাত্র নবী রাসূল (সঃ) গণের দেখানো পথই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ বা صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখলে দেখা যায় আমাদের মধ্যে এমন বহু ফেরকা রয়েছে যারা আল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলে না, বলে শায়খের বা বোজর্গের বা মুরব্বির উদ্ধৃতি দিয়ে। তাদের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের পছন্দ মত কোন বোজর্গ ব্যক্তির লেখা কোন বই পড়াকে নিজেদের জন্যে বাধ্যতামূলক মনে করে নিয়েছেন; পক্ষান্তরে আল্লাহর পবিত্র কালামের তাফসীর পড়ে আল্লাহ কি বলেছেন তা জানাকে তারা গোমরাহী মনে করে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন; আল-কুরআন বুঝার মত জ্ঞান আমাদের নেই। একথা বলবেন তাঁরা যারা ২/১টা ফরেন ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরাও যারা মাদ্রাসার শিক্ষায় উচ্চ সনদ প্রাপ্ত। ঐ একই কথা বলবেন যে কুরআন বুঝার মত জ্ঞান আমাদের নেই। কাজেই কুরআন যে সব বোজর্গ ব্যক্তি বুঝে ছিলেন তাঁদের বাতলানো পথেই চলি, তাতেই আল্লাহ রেহাই দিবেন। যুক্তিটা অত্যন্ত মনঃপুত যুক্তি হলেও এর পিছনে যে মূল জিনিসটা কার্যকর রয়েছে

www.pathagar.com

তা হচ্ছে কৌশলে আল-কুরআনের পথ থেকে সরে পড়া ও লোকদেরকে সরানো। তা না হলে একথা কি ঠিক হবে যে বিংশ শতাব্দীর লোক তাদের মাতৃভাষায় আল-কুরআনের কোন অনুবাদ পড়েও সে কিছুই বুঝবে না, এটা কি কোন যুক্তি হতে পারে? এদেরই কথা আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা বোজর্গ সেজে (বা আহবার রোহবান হয়ে) يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরায়। বলা বাহুল্য, আল-কুরআন থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে গেলে এ সব জায়গায় ধরা পড়তে হবে তাই সরাসরি বলে দেয়া হয় কুরআন পড়ার মত কোন জ্ঞান আমাদের নেই, তাই কোন অনুবাদ পড়তে যেওনা, তাহলে বিভ্রান্ত হবে। আসলে আমি বলব কুরআন পড়ে কেউ কোন যুগে বিভ্রান্ত হয়নি বরং বিভ্রান্ত হয়েছে কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে সরে আহ্বার ও রোহবানদের রাস্তায় চলে। পূর্ব যামানায় (রাসূলের পূর্বে) যারা ধর্মীয় নেতা বা পীর মুরশিদ ছিলেন তাদেরকে আহবার রোহবান বলা হত। তারা বলত ধর্মীয় জ্ঞান আমাদেরই বেশী হুজুরে পাক (সঃ)-এঁর চাইতে। তারা হুজুর (সঃ)-কে বলত গোমরাহ এবং তারা মনে করত আমরাই ঠিক পথে আছি। তাদের কথার প্রতিবাদ করে আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বললেন, "না ওদের কথা ঠিক নয়, তুমিই عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সঠিক পথে রয়েছ (সূরা ইয়াসিন)। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আল্লাহর রাস্তা থেকে আল্লাহ বিশ্বাসীদের ফিরানো ঐ একটাই মাত্র পথ তা হচ্ছে এই তাফসীরের প্রতি ঝোঁক কমিয়ে হুজুরদের লেখা কেতাবের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করে দেয়া। আমি নিজে একদিন এক দ্বীনদার এ্যাডভোকেট সাহেবের নিকট একখানা তাফসীর গ্রন্থ নিয়ে বললাম, এ্যাডভোকেট সাহেব আপনি যেহেতু একজন দ্বীনদার তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি তাফসীর খানা নিন, পড়ে আমাকে ফেরত দিবেন। তিনি ২ খানা অজিফার কেতাব বের করে দেখিয়ে বললেন, দেখুন হুজুর এগুলো প্রত্যহ এক খতম পড়ার হুকুম দিয়েছেন তাই এগুলো পড়ার পরে আমার হাতে আর কোন সময় থাকে না, তাই পড়ব কখন বলুন? আমি বললাম, তা'হলে কি আল্লাহর কথার চাইতে এটার মূল্য বেশী।

www.pathagar.com

مُسْتَقِيْم এর ৩য় ব্যাখ্যা

مُسْتَقِيْم এর নিকটতম অর্থ বুঝানোর জন্যে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহার করা হয়। আরবী যে মূল শব্দ থেকে قَائِمٌ সেই মূল শব্দ থেকেই اِسْتِقَامَتْ বা এমনভাবে সুদৃঢ় যা সঠিক বা নির্ভুলভাবে সঠিক স্থানে সুদৃঢ়। এ কথাটাকে বুঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যার থেকে اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর ভাবার্থ বুঝতে কিছুটা সহজ হবে বলে আমি মনে করি। দেখুন, ট্রেন চলে যে পথ ধরে ঐ পথটা এমন এক নির্দিষ্ট পথ যে ঐ পথ বিহনে ট্রেন চলতেই পারে না। কাজেই এই ধরনের সুনির্দিষ্ট পথকেই বলা চলে اَلصِّرَاطْ বা একমাত্র পথ। ঐ রাস্তা দিয়ে যত গাড়ীই চলুক না কেন তার ঐ একটাই মাত্র পথ। ঠিক তদ্রুপ যত মানুষই বেহেশতে যেতে চায় তাদের প্রত্যেকেরই ঐ একটাই মাত্র পথ। কাজেই সে পথকে বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে اَلصِّرَاطْ আর সঠিক পথে এমনভাবে সুদৃঢ় হয়ে থাকা যেন তার থেকে একচুল পরিমাণও সরে নড়ে না যায়। এভাবে সুদৃঢ় হয়ে থাকাকেই আরবীতে মুস্তাক্বীম বলে। এর উদাহরণ দেয়া চলে ট্রেনের চাকার সেটিং এর সঙ্গে। ট্রেনের দু'টি চাকাকে এমনভাবে সেট করা হয় যেন চাকা দু'টি তার চলার পথের সঙ্গে সমসূত্রে পড়ে এবং তার মাপজোকে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। আর তা যেন এমন মজবুত ভাবে নাট বল্টু দিয়ে এটে দেয়া হয় যেন চলার পথে যত বড়ই ধাক্কা আসুক না কেন চাকা যেন এক চুল পরিমাণও নড় চড় না হয়। এই ধরনের সঠিকভাবে নির্ভুল পন্থায় অত্যন্ত মজবুত করে কোন কিছুকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দরভাবে দাঁড় করিয়ে রাখাকেই আরবী মুস্তাক্বীম শব্দ দ্বারা বুঝান হয় তাহলে মানুষ যে صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর উপর থাকতে চায় সে পথটা কিরূপ হতে হবে? এর জবাবে আল্লাহ বলেন هٰذَا صِرَاطٌ

www.pathagar.com

مُّسْتَقِيمٌ এই (কুরআনই) সঠিক পথ। অর্থাৎ ট্রেনের চাকা যেমন তার চলার লাইনের সঙ্গে এক নির্দিষ্ট মাপ মত সেট করা ঠিক তেমনই মুসলমান যারা বেহেশ্‌তের পথে চলতে ইচ্ছুক তাঁরা তাঁদের চলার পন্থাকে আল-কুরআনের আইনের নাট বল্টু দ্বারা এমনভাবে মজবুত করে এঁটে শেঁটে বেঁধে নেয় যেন তার চলার সময়ে যত প্রকার ধাক্কাই লাগুক না সে যেন তার চলার পথ থেকে সরে নড়ে না যায়। এভাবে একটা নির্দিষ্ট নীতি আল-কুরআনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি তার উপর কায়েম থাকাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর কায়েম থাকা।

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর ৪র্থ অর্থ

এ পথকে বুঝানোর জন্যে এর পরবর্তী কথায় বলা হচ্ছে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ। অর্থাৎ সেটা কোন গজবের ও গোমরাহীর পথ নয়। এ কথার মধ্যে মেহেরবান আল্লাহ পাকের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে পূর্ব জামানায় বহু কিতাবধারী জাতি যে পথ ধরে চলার কারণে গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল আমরা যেন তাদের পথে না চলি। অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাছারা যে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে দ্বীনের সঠিক বুঝ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল আমরা যেন তেমন না হই। ইয়াহুদ ও নাছারাদের মধ্যে এমন বহু নাম করা আলেম ছিল যাদের ধারণা ছিল যে আমরা ঠিক পথেই রয়েছি, কিন্তু হুজুরে পাক (সঃ) দেখলেন যে তারা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এটা শুধু সে যুগেরই ব্যাপার নয়, বরং এটা হচ্ছে প্রত্যেক যুগের ঘটনা যে কিছু দ্বীনদার লোক মনে করেন আমরা ঠিক পথেই রয়েছি, কিন্তু আল-কুরআনের কষ্টি পাথরে যাচাই করলে দেখা যায় অনেকেই صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ থেকে সরে পড়েছেন কিন্তু তা তাঁরা টের পাচ্ছেন না। মানুষ এরূপ হবে একথা আলেমূল গায়েব আল্লাহ তো পূর্ব থেকেই জানেন তাই তিনি কুরআন পাকে অহি নাযিল করে নবী (সঃ)-কে বললেন, আপনার উম্মতদেরকে সাবধান করে দিবেন যেন তারা

www.pathagar.com

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۔ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ۔

(আল-কুরআন-২৭ পারা)

তাদের মত না হয় যাদের উপর বহু পূর্বে কিতাব নাযিল হয়েছিল বা যে জাতিকে পূর্বে কিতাব দান করা হয়েছিল, পরে বহুদিন তাদের উপর দিয়ে কেটে গেল। অতঃপর তারা (ক্রমে ক্রমে দ্বীন থেকে সরে এসে) তাদের অন্তরকে শক্ত করে ফেলল, তাদের অধিকাংশই ফাসেক বা দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদকারী।" অর্থাৎ পূর্বকালে প্রত্যেক নবী (সঃ)-এর পরে তাদের উম্মত ক্রমে ক্রমে মূল ইসলাম থেকে সরে পড়েছে, কিন্তু তা তারা টের পায়নি। মনে করেছে আমরা ঠিকই সঠিক দ্বীনের উপর রয়েছি এবং এই ধারণায় তাদের মনকে তারা শক্ত ও মজবুত করে নিয়েছে। অতঃপর পরবর্তী নবী (সঃ) এসে তাদের অনেকের মগজে এ কথা ধরাতে পারেননি যে তারা ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে বরং তারা দৃঢ়তার সঙ্গেই মনে করেছে যে তারাই ঠিক আর নবী (সঃ)-এর দাওয়াত ভুল। তারা শুধু যার যার নিজের মতকেই সত্য মনে করত আর ভিন্নমত- তা প্রকৃত বাতিলই হোক বা ঠিকই হোক এক টানা সবগুলোকেই ভ্রান্ত মনে করত। এমনকি হুজুর (সঃ)-এর মতকেও ভ্রান্ত মনে করত। তাদের এই ধারণার কথা সূরা বাকারার ১১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۔

ইয়াহুদীরা বলত নাছারাদের নিকট কিছুই নাই, (ওরা ভ্রান্ত) আবার নাছারারা বলত ইয়াহুদীদের নিকট কিছু নাই (অর্থাৎ সত্য দ্বীন নাই, ওরা ভ্রান্ত) অথচ তারা আসমানী কিতাবের অনুসারী ও পাঠক ছিল। ঠিক সেই

www.pathagar.com

ইয়াহুদী নাছারাদের মতই (আজও) যাদের নিকট কিতাবের কোন জ্ঞান নেই। [তারা বলে যে আমরাই ঠিক অন্যেরা ভ্রান্ত। অথচ যারা এরূপ বলে তারা আল কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী নন, তারা শুধু তাদের ধারণায় মুত্তাকিন। প্রকৃতপক্ষে তারা صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ থেকে দূরে সরে গিয়ে সেখানেই নিজের ঈমানকে দৃঢ় করে নিয়েছে।] অতঃপর আল্লাহই কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন যে, কে ঠিক আর কে বেঠিক যে বিষয়ে আজ তাদের মধ্যে মত পার্থক্য হচ্ছে।'

এখানে একটা নূতন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে তা হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত কথা যিনিই পড়বেন তিনিই মনে করবেন যে, এই তো আল্লাহ আমার মতকেই ঠিক বলেছেন। এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি একটা মূলনীতি পেশ করছি। এ মূলনীতির সঙ্গে যার মতের মিল রয়েছে তিনিই ঠিক صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর উপর রয়েছেন আর মুলনীতির সঙ্গে যার মতের মিল নেই তারই মত ভুল। মূল নীতি হচ্ছে এই যে--

১। প্রত্যেক নবীরই বিশেষ করে আমাদের রাসূলের (সঃ) কণ্ঠ সর্বদাই অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল।

ঃ আপনার কণ্ঠ কি তেমন অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার আছে?

২। সমাজের প্রত্যেকটি আল্লাহ বিরোধী আইন-কানুন ও প্রথা প্রচলন সমাজ থেকে তুলে দিয়ে সেখানে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-এর সংগ্রাম ছিল আপোসহীন ও বিরামহীন।

ঃ আপনি কি এ সংগ্রামে একমত? আপনি কি এই ধোঁকায় পড়েছেন, যে নবী (সঃ) সংগ্রাম করেছিলেন কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে।আমি সংগ্রাম করব কার বিরুদ্ধে? তা'হলে আমি বলব, আপনি কি খোঁজ রাখেন যে নবী (সঃ) যাদের সঙ্গে জিহাদ করেছিলেন তারা আল্লাহকে মানত? আর আল-কুরআন থেকে কি সরাসরি খোঁজ নিয়েছেন যে কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আল্লাহ বলেছেন? দেখুন, সূরা তওবায় ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ التوبة ـ ٢٩

"যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে (১) যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। (২) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যে কাজ হারাম করেছেন সে কাজ যারা নিজেদের জন্যে হারাম করেনি (৩) এবং যারা আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী হয়েও আল্লাহর দেয়া সঠিক দ্বীন বা সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে নিজেদের বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেনি। (তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর) যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া প্রদান করে।" তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন।

ঃ আপনি হিসেব করে দেখুন আপনি কি কোন অজুহাত খাড়া করে এ পথ থেকে এড়িয়ে যেতে চান, তা যদি চান তা হলে আপনি ভ্রান্ত। আর তা যদি না চান তবে আপনি ভ্রান্ত নন।

৩। আপনি কি জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে আগ্রহী? না কি আপনি মনে করেন যে ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহর আইন যথাযথভাবে পালন করতে হবে আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র যখন যে আইন তৈরী করে তখন তা মেনে চললে কোন পাপ নেই।

ঃ তা যদি মনে করেন তা হলে আপনি ভ্রান্ত। কারণ কোন নবীই (আঃ) তা মনে করতেন না।

এভাবে হুজুরে পাক (সঃ)-এর প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে আপনার কাজকে মিলিয়ে দেখুন। যদি দেখতে পান যে, হ্যাঁ রাসূলের (সঃ) কাজের সঙ্গে আপনার কাজের ও আকিদার হুবহু মিল রয়েছে তা' হলে অবশ্যই আপনি ভ্রান্ত নন, আপনি তা'হলে 'ঠিক' এর উপর কায়েম রয়েছেন।

আর বর্তমান যুগে বেহেশ্‌তে যাওয়ার এক সহজ পথ আবিষ্কার হয়েছে যে পথে কোন ঝুঁকি ঝামেলা নেই, কারও সঙ্গে কোন দ্বন্দ্বও নেই কোন সংগ্রামও নেই, কারও বদ নজরে পড়ার কোন ভয়ও নেই, আছে শুধু

www.pathagar.com

বিরোধমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় সময় দান। এ পথ কিন্তু নবীর (সঃ) আবিষ্কৃত পথ নয়, এ হচ্ছে পরবর্তী কালের কোন দ্বীন দরদী আল্লাহভক্ত অলি দরবেশগণের (রাঃ) নাম করে কোন অদৃশ্য শক্তির আবিষ্কৃত পথ। এ পথ যে প্রকৃতপক্ষে اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর পথ নয় তা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে প্রত্যেকেরই মগজে ধরা পড়বে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই খানে যে নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা করার মত মগজ আমাদের মধ্যে খুব কম।

বুদ্ধিমানের লক্ষণ

এ জগতে তারাই বেশী বুদ্ধিমান যারা নিজের মতকেই সত্য মত বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার পরিবর্তে প্রকৃত সত্যকেই সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু কিছু লোক আছেন যারা মনে করেন সত্য মিথ্যার ফয়সালা আল্লাহর দরবারেই হবে, এখন যা করে যাচ্ছি তা ঠিকই করছি। কে কি বলে তা শুনবই না কানে তুলো দিয়ে রাখব। কারও কথা শুনব না কোন বই পুস্তকও পড়ব না এবং আমার মত ছাড়া যে আর কারও মত সত্য হতে পারে এমন কোনও চিন্তাও মগজে ঢুকতে দেব না। এদের জন্যে আফসোস যে সত্য তাদের চোখের সামনেই ছিল কিন্তু তা তারা দেখবে না বলে চোখ বন্ধ করেই পথ চলে। এরা কিন্তু বুদ্ধিমান নয়। আপনি চিন্তা করুন আপনার নিজের স্বার্থেই। আপনি মানুষ রবকে ঘাড়ের উপর বসিয়ে রেখেই আল্লাহকে রাজী-খুশী করবেন এটা আপনার কেমন অদ্ভুত চিন্তা। কিন্তু এরূপ চিন্তা কি রাসূল (সঃ)-এর ছিল? তিনি তো বললেন–اِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ـ নিশ্চয়ই তরবারির ছায়া তলে বেহেশ্‌ত। আপনি তার উল্টো চিন্তা কি করে করেন?

www.pathagar.com

صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর ৫ম ব্যাখ্যা

এ পথ যেহেতু পায়ে হাঁটার পথ নয়, পথ হচ্ছে জীবন-যাপনের, তাই আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে জীবন যাপনের পথটা কি করে মুস্তাক্বীম হতে পারে।

অর্থাৎ মুস্তাক্বীমের উপর জীবন-যাপনের অবস্থাটা কিরূপ হতে হবে এটাই আমাদের বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেখুন আমরা জন্মের পর থেকে শুরু করে ক্ববরে যাওয়া পর্যন্ত যত যা কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি তার প্রত্যেকটি কাজই হতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক তা'হলেই থাকা হবে صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর উপর। অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, বৈষয়িক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিককার প্রতিটি কার্যকলাপই হতে হবে আল্লাহর মনোনীত পন্থায়। অর্থাৎ আমাদের লেখা-পড়া, সাহিত্য ও কাব্য চর্চা, অংক ও বিজ্ঞান চর্চা, দর্শন ও প্রযুক্তি বিদ্যা চর্চা, আমাদের রেডিও, টেলিভিশন, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি চুক্তি, আমাদের ব্যাংক বীমা, আমাদের আইন আদালত, বিচার-ফয়সালা, আমাদের কৃষি ও কারিগরি, আত্মীয় ও শত্রুতা, আমাদের বিবাহ-শাদী, আমাদের সন্তান পালন ও তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবহার, দেশবাসীর প্রতি আচরণ, স্বমতের লোকদের কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজই হতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক। তবেই হবে صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর উপর জীবন যাপন; নইলে নয়। এ ছাড়াও এর মধ্যে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এ সূরাটি হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ মোনাজাত। এ সূরার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিকট কিছু চায়। আর কিছু চাইলেই পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করা লাগে। যেমন– যারা মোনাজাত করে আল্লাহর নিকট চায় যে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষায় পাস করাও। তারা পড়ে ও পরীক্ষা দেয় তার পরই তারা বলে যে আল্লাহ আমায় পাস করাও। যে আদৌ পড়ে না ও পরীক্ষা দেয় না সে কি

www.pathagar.com

আল্লাহকে বলে যে আল্লাহ আমায় পাস করাও? তাহলে প্রমাণ হলো আল্লাহর নিকট কিছু চাইলে তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আমরা কম করে হলেও প্রত্যেক দিন অন্ততঃ ৪০ বার আল্লাহকে বলি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অথচ একবারও চেষ্টা করি না সে পথে চলার। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা।

বুদ্ধিমান ঈমানদারদের উচিৎ হবে, তারা যা আল্লাহর নিকট চায় তা পাওয়ার জন্য চরম চেষ্টা করা। অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলতে চাইলে সে পথ সৃষ্টি করার বা সে পথে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করা লাগবে, নইলে সে পথে চলা যাবে না।

এই বুঝগুলো মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই সূরা ফাতেহাকে আল্লাহ নিত্য পাঠ্য করেছেন।

সিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা ইসলামী পথ ও পরিবেশ কি ও কেন?

চিন্তা করলে প্রত্যেকের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়বে যে ট্রেন এবং মোটর বাস যেমন যার যার উপযোগী রাস্তা ছাড়া চলতে পারে না এবং যেমন পারে না বাসের রাস্তায় ট্রেন চলতে আর ট্রেনের রাস্তায় বাস চলতে ঠিক তেমনই পারে না, ইসলাম তার নিজস্ব রাস্তা ছাড়া ভিন্ন রাস্তায় চলতে। বলা বাহুল্য, ইসলামের পরিপন্থী রাস্তায় চললে যে ইসলামের পথে চলা হয় না তা বুঝানোর জন্যেই বলা হয়েছে "আমি চলতে চাই–

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ـ

এর পথে।" অর্থাৎ যে পথ গযবের নয় এবং গোমরাহিরও নয়, যে পথ ইসলামের নিজস্ব আমি সেই পথেই চলতে চাই। অর্থাৎ ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে অবশ্যই ইসলামী পথ হতে হবে। যার নাম হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাক্বীম।

ইসলাম যেহেতু কতকগুলো আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের সমষ্টি তাই সে চায় সমাজে তার নিজস্ব আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের একটা পরিবেশ।

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে, আমরা একথা ভালই বুঝি যে প্রতিকুল পরিবেশে কারুরই টিকা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা কেন বুঝি না যে ইসলামের পরিপন্থী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন-যাপন সম্ভব নয়। দেখুন ট্রেন চালাতে হলে যেমন তার চলার জন্যে একটা রাস্তা তৈরী করে নিতে হয়, তেমন কোন দেশে বা কোন সমাজে ইসলাম চালাতে হলেও তার উপযোগী একটা পথ বা পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হয়। আর বাসের রাস্তায় ট্রেন চলতে না পারায় যেমন ট্রেনের অযোগ্যতা বুঝায় না ঠিক তেমনই গায়ের ইসলামী রাষ্ট্রের বা গায়ের ইসলামী সমাজে ইসলাম চলতে না পারায় ইসলামেরও কোন অযোগ্যতা বুঝায় না। বরং ট্রেন তার নিজস্ব পথে চলার কারণে সে যেমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঠিক তেমনই ইসলাম তার নিজস্ব পথেই চলতে পারা এবং ভিন্ন পথে চলতে না পারার কারণেই সে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থাৎ যার নিজস্ব পথ নেই, সে যার তার পথে চলতে পারে। কিন্তু যার নিজস্ব পথ আছে সে কেন যার তার পথে চলবে? আর যার নিজস্ব কোন আইন-কানুন নেই, সে যে কোন আইন মানতে পারে কিন্তু যার নিজস্ব আইন-কানুন রয়েছে সে কেন ভিন্ন আইন-কানুনের খোঁজ করবে?

এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই যে, যে কোন ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত জীবনে শুধু ইসলামকে মেনে নেয়, কিন্তু সে যে সমাজে ও রাষ্ট্রে বাস করে সে সমাজ ও রাষ্ট্র যদি ইসলামকে কবুল না করে তবে ঐ ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি জীবনেই ইসলামের অনুসারী হতে পারেন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি অবশ্যই ইসলাম বিরোধী আইনের অনুসারী হতে বাধ্য। এই কারণেই ইসলামী জীবন-যাপনের জন্য ইসলামী পথই হতে হবে, অর্থাৎ মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলাম কবুল করতে হবে, তবেই সে সমাজের জীবন-যাপনের পুরা ব্যবস্থাপনা বা পথটাই হবে সিরাতুল মুস্তাক্বীম এবং ঐ পথে চললেই তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হবে না এবং তারা কোন প্রকার গোমরাহীর মধ্যেও পড়বে না।

আশা করি সূরা ফাতেহার এ মৌলিক শিক্ষাগুলো আমরা হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হব। এবার আসুন مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতে مٰلِكِ শব্দটির উপর আরও কিছু বাড়তি আলোচনা করি এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক আয়াতের সাহায্যে মালিক হিসেবে আল্লাহর পরিচয় জেনে নেই।

www.pathagar.com

মালিক হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
আল্লাহই যে সব কিছুর মালিক এবং
আসমান ও যমীনের তিনিই যে একমাত্র
বাদশাহ তার উপর মূল দারস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

الحشر : ٢٤-٢٣

তিনি আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কেউ সার্বভৌমত্বের মালিক নেই। তিনিই মালিক তিনিই বাদশাহ। অতীব মহান পবিত্র তিনি। পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাদানকারী সংরক্ষক তিনি। সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ বিধানে শক্তি প্রয়োগকারী ও তা কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্বের দাবীদার। আল্লাহ পবিত্র মহান সেই শিরক হতে যা মানুষেরা করতেছে। তিনি আল্লাহ যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী। এবং সেই (পরিকল্পনা) অনুযায়ী আকার আকৃতি রচনাকারী। তাঁর জন্যে রয়েছে অতীব উত্তম নামসমূহ। আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর তসবীহ করে। তিনি খুবই প্রবল ও মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ- هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ তিনি আল্লাহ যিনি। لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইলাহ বা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নেই। اَلْمَلِكُ একমাত্র বাদশাহ। اَلْقُدُّوْسُ একমাত্র অতীব মহান পবিত্র সত্তা। اَلسَّلٰمُ একমাত্র শান্তিদাতা। اَلْمُؤْمِنُ একমাত্র নিরাপত্তা দানকারী। اَلْمُهَيْمِنُ একমাত্র সংরক্ষণকারী। اَلْعَزِيْزُ একমাত্র মহা পরাক্রম শালী। اَلْجَبَّارُ একমাত্র (ক্ষমতাবান যিনি) শক্তি প্রয়োগ ও কার্যকর কারী। اَلْمُتَكَبِّرُ একমাত্র ক্ষমতার বড়াইকারী। سُبْحٰنَ اللّٰهِ আল্লাহ সর্বপ্রকার দুর্বলতা, অক্ষমতা, ত্রুটিবিচ্যুতি ইত্যাদি থেকে পবিত্র এবং পবিত্র (সেই শিরক হতে) عَمَّا يُشْرِكُوْنَ যে শিরক তারা করতেছে هُوَاللّٰهُ তিনি আল্লাহ। اَلْخَالِقُ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। اَلْبَارِئُ একমাত্র সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী। اَلْمُصَوِّرُ পরিকল্পনা মুতাবিক আকার আকৃতি দানকারী বা রচনাকারী। لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى সমস্ত উত্তম নামগুলো তাঁরই। يُسَبِّحُ لَهٗ তাঁর তসবীহ করে বা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আকাশসমূহে এবং যমীনে আছে। وَهُوَ এবং তিনি। اَلْعَزِيْزُ -একমাত্র মহা পরাক্রমশালী। اَلْحَكِيْمُ একমাত্র মহা বিজ্ঞানময়।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষকে আল্লাহ করেছিলেন খলিফা; মানুষকে আল্লাহ কখনও রাজা বাদশা করেননি। তবে তিনি মানুষকে রাজত্ব দান করেন এই অর্থে যে মানুষ রাষ্ট্রের মালিক না হয়ে মালিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহর দেয়া আইনের প্রয়োগ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু, মানুষ ক্ষমতা হাতে পেয়ে দাবী করে বসল আমিই মালিক। যেমন দাবী

www.pathagar.com

করল নমরূদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন ও তাদের উত্তরশুরীরা। তাই মেহেরবান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। অন্যকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে মানলে আসলে তাকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হয়ে যায় عَمَّا يُشْرِكُوْنَ থেকে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এখানে এ ৩টি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সেই নামগুলোরই উল্লেখ করেছেন যে, নামের দাবী মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে করতে চায়। অর্থাৎ ঐ নামের মধ্যে আল্লাহর যে গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে গুণের দাবীদার হ'তে চায় দুনিয়ার সব মানুষই। কিন্তু তা তো হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ঐ সব নামের সঙ্গে ال জুড়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন ঐসব গুণবাচক নামের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই।

মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যা দাবী করে

(১) মানুষের প্রথম দাবীই হচ্ছে এই যে আমি مَلِكٌ (মালিক) বা বাদশাহ। তার জবাবে আল্লাহ বলছেন তোমার ঐ দাবী ভুল, কারণ আমিই اَلْمَلِكُ একমাত্র মালিক।

(২) মানুষ বাদশাহ হয়ে দাবী করে আমি ত্রুটিবিচ্যুতির উর্ধ্বে। আমি قُدُّوْسٌ (কুদ্দুস)। আল্লাহ বলেন– না, তোমাদের এ দাবী ঠিক নয় তোমরা ত্রুটিবিচ্যুতির উর্ধ্বে হতে পার না। এ গুণ শুধুমাত্র আমার মধ্যে আছে। এজন্যে আমিই اَلْقُدُّوْسُ বা একমাত্র পবিত্র সত্তা।

(৩) মানুষ রাষ্ট্র হাতে পেলে দাবী করে سَلَامٌ বা শান্তি ও শান্তিদাতা হওয়ার। মানুষ রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার জন্যেও দাবী করে যে আমাকে ভোট দাও, আমি তোমাদের শান্তিতে রাখব। কিন্তু, মানুষ রাজা-বাদশাহ হয়ে কোন দিনও মানুষকে শান্তিতে রাখতে পারে না। পারেন একমাত্র আল্লাহ। এই জন্যে বললেন আমিই اَلسَّلَامُ (আস-সালামু) একমাত্র শান্তিদাতা।

www.pathagar.com

যার নিজের শান্তির দরকার সে শান্তিটুকু নিজের জন্যেই রাখতে চায় সে অন্যকে তা দিতে চায় না। আর যার নিজের কিছুই দরকার নেই তিনিই দিতে পারেন সবকিছুই কারণ তিনি যা দিবেন তার একটা ভাগ বা একটা অংশ তার নিজের জন্যে রেখে দেয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

(৪) মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দাবী করে যে, তারা জনগণের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহ বলেন– তা সম্ভব নয়, কারণ তার নিজের জীবনের নিরাপত্তা তো তার হাতে নেই কাজেই সে অন্যের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি করে করবে? তাই আল্লাহ বলেন আমিই اَلْمُؤْمِنُ (আল-মু'মিনু)[১] বা একমাত্র নিরাপত্তাদানকারী।

(৫) মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দাবী করে আমিই আমার দেশের জনগণের জানমালের হেফাজতকারী। কিন্তু আল্লাহ বলেন তোমাদের এ দাবী ঠিক নয়। কারণ যেখানে তোমার নিজের জান মালেরই হেফাজত তুমি নিজে করতে পার না, সেখানে অন্যের জানমালের হেফাজত তুমি কি করে করবে? এটাও কোন মানুষের জন্যে সম্ভব নয়। তাই তিনি বললেন আমিই اَلْمُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিনু) বা একমাত্র সংরক্ষণকারী।

(৬) মানুষ ক্ষমতার জোরে অনেক রাষ্ট্র দখল করে এবং দাবী করে যে 'আমি একজন মস্তবড় বীর, আমি একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা, আমার ক্ষমতার কাছে সবাই নত' ইত্যাদি ধারণা মানুষের মগজে অনেক সময় স্থান পায়। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা খুবই নগণ্য। ক্ষমতাধর একমাত্র আল্লাহই। তাই তিনি বললেন ক্ষমতার দাপট আর কারও নয়; এ দাপট আমারই। কারণ আমিই হচ্ছি একমাত্র اَلْعَزِيْزُ (আল-আযীয) মহা পরাক্রমশালী।

(৭) মানুষ রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা হাতে পেয়ে মনে করে আমি জোর জবরদস্তি করে যা খুশী তা করতে পারি। কিন্তু আসলে তা পারে না, পারে একমাত্র আল্লাহই। তাই তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন একমাত্র তিনিই اَلْجَبَّارُ (আল-জাব্বার) যা খুশী তাঁর প্রয়োগের ক্ষমতা রাখেন।

টীকা ১. আল্লাহ যখন মু'মেন তখন তাঁর অর্থ হয় নিরাপত্তাদানকারী আর মানুষ যখন মু'মেন তখন তাঁর অর্থ হয় বিশ্বাসী।

www.pathagar.com

(৮) মানুষের স্বভাবই হলো এমন যে একটু ক্ষমতা পেলেই ক্ষমতার বড়াই করা শুরু করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ বলছেন ক্ষমতার বড়াই কেউই করতে পারে না; পারি শুধু আমি একাই। কারণ আমিই হচ্ছি একমাত্র اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বিরু) বড়াই করার বা বড়ত্বের দাবী করার অধিকারী।

আল্লাহর এই যে ৮টা এমন গুণ ও ক্ষমতার কথা বলা হলো যা মানুষ মানুষের মধ্যে আছে বলে ধরে নেয় এরা যে প্রকারান্তরে আল্লাহর গুণে এবং ক্ষমতায় মানুষকে অংশ দিয়ে শেরেকী করে তা মানুষ বুঝেও বুঝতে চায় না, এই জন্যে এখানে খুবই স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে দুনিয়ার কোন মানুষই এ ৮টি গুণের ও ক্ষমতার মালিক নয়। যারা এ ব্যাপারে মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ যে ব্যাপারে তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করে সে ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র।

এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ লোকদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তিনি هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী এবং পরিকল্পনা মুতাবিক তার আকার আকৃতি রচনাকারী। আর যত প্রকার উত্তম গুণবাচক নাম আছে তার অধিকারী একমাত্র তিনিই, তাই বলা হলো لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ সমস্ত উত্তম নাম তারই। এর পর বলা হলো তিনি এমনই এক বাদশাহ যিনি বাদশাহ হওয়ার পর এমন একটা জিনিস পান যা দুনিয়ার কোন মানুষ বাদশাহর দাবীদার তা পায় না। তা কি? তা হচ্ছে শতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের কাছ থেকে পান প্রশংসা। মানুষের বেলায় দেখা যায় একবার কেউ রাজা-বাদশা হতে চাইলে মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যে কেউ হয়ত কিছু স্বার্থের জন্যে তার সামনে খুব প্রশংসা করে কিন্তু অসাক্ষাতে

www.pathagar.com

তাকে গালি দেয়। অপর পক্ষে আল্লাহ এমনই এক বাদশাহ যার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি কেউ কোন দিনই পায় না, বরং পায় দয়া আর দয়া এবং ক্ষমা আর ক্ষমা। কাজেই ন্যায় সঙ্গত কারণেই–

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আকাশ সমূহে আছে এবং যা পৃথিবীতে আছে তারা সবাই। আর তিনি হচ্ছেন وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ মহা পরাক্রমশালী এবং মহা বিজ্ঞানময়।

আসমান ও যমীনের মালিক যে একমাত্র আল্লাহর তা বুঝানোর জন্যে আল-কুরআনে আরও যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো, তবে শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা শুধু মাত্র প্রথম ও মূল দারসের মধ্যেই দেয়া সম্ভব হলো, এর পর উল্লিখিত দারসের আনুসাংগিক যে সব আয়াত পরে আনা হয়েছে তা মূল তাফসীরের ভাবধারাকে সামনে রেখে চিন্তা করলে প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার নিরপেক্ষ মগজ থেকেই বেরিয়ে আসবে তার সঠিক ব্যাখ্যা। কাজেই কিতাবের কলেবর যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্যে আনুসাঙ্গিক আয়াতগুলোর শুধু অনুবাদই দেয়া হলো।

আনুসাংগিক আয়াতসমূহ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ المائدة ١٧

আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যকার যাবতীয় সব কিছুর নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর। অর্থাৎ তিনিই এসব কিছুর উপর একমাত্র রাজা বা বাদশাহ।

এর পরবর্তী আয়াতে অন্য এক প্রসঙ্গে ঐ একই ভাষায় আল্লাহ বলেছেন,

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ المائدة ٤٠

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ তুমি কি জান না যে– আসমান ও যমীনের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে খুশী শাস্তি দিবেন এবং যাকে খুশী ক্ষমা করবেন। তিনিই সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। এই বাদশাহীর মধ্যে কারও কোন অংশ নেই। এটাই আল-কুরআনের শিক্ষা।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ المائدة ـ ١٧

আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুর উপর আল্লাহই একমাত্র বাদশাহ। আর তিনিই সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ـ طه ـ ١١٤

অনুবাদ ঃ অতএব, উচ্চ ও মহান সেই আল্লাহ যিনি প্রকৃত বাদশাহ।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ المؤمنون ـ ١١٢

অনুবাদ ঃ অতএব, উচ্চ ও মহান সেই আল্লাহ যিনি প্রকৃত বাদশাহ। যিনি ছাড়া আর কেউ প্রভূ নেই। সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আরশের মালিক।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ الجمعة ـ ١

অনুবাদ ঃ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে এমন প্রত্যেকটি বস্তু বা জিনিস যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। তিনিই রাজাধিরাজ, মহা পবিত্র, মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ

www.pathagar.com

الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ ال عمران ٢٦ ـ

অনুবাদ ঃ বল, হে আল্লাহ, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর আর যাকে ইচ্ছা তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যাকে ইচ্ছা অপমাণিত ও লাঞ্ছিত কর। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ الفاتحة ـ ٣

তিনি বিচার দিনের মালিক। যে দিন কারও কোন প্রকার প্রভূত্ব থাকবে না। সে দিন মানুষ ভাল করেই বুঝবে যে প্রকৃত বাদশাহ কে এবং বাদশাহ বলে মেনেছি কাকে?

আল্লাহকে مٰلِكْ হিসেবে মানার অর্থ হলো আল্লাহকে একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক হিসেবে মেনে নেয়া। আমরা যেমন একটা জিনিস জানি যে সব ধর্মে সব নিয়ম-কানুন একই ভাবে থাকে না। যেমন ইসলাম ধর্মে নামায আছে কিন্তু অন্য ধর্মে নামায নেই। ঠিক তেমনই হিন্দু ধর্মে পূজো অর্চনা আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। ঠিক তেমনই অন্য ধর্মে মানুষের উপর মানুষ রাজা-বাদশাহ আছে কিন্তু ইসলামে মানুষের উপর মানুষ রাজা-বাদশাহ নেই। এতে আছে খলিফা হওয়ার বিধান। এখানে রাজা-বাদশাহ হওয়ার কোন বিধান নেই।

আপনাদের অনেকেরই জানা আছে যে, রোমের রাষ্ট্রদূত যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ

'আ'য়না মলিকুকুম', তোমাদের বাদশাহ কোথায়? তার জবাবে লোকেরা বলেছিল 'মা লানা মালিকুন বাল লানা আমীর।' অর্থাৎ (আমরা তো জাতে মুসলমান কাজেই) আমাদের কোন মালিক নেই। বরং আমাদের একজন আমীর আছেন। এর থেকেও প্রমাণ হলো মানুষের উপর মানুষ রাজা-বাদশাহ হবে এবং তার খেয়াল খুশীমত রাষ্ট্র চালাবে তা হতে পারে না। মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে শুরু করে পরবর্তী

www.pathagar.com

খলিফাগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। এর পর যখনই রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম ঢুকেছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের দিকে মোড় নিচ্ছিল ঠিক তখনই রাসূলের আওলাদ হযরত হুসাইন (রাঃ) তার বিরোধীতা করলেন। বললেন এটা ইসলামে নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন দিয়েও প্রমাণ করলেন যে, যা ইসলামে নেই তা সমর্থন করে জীবন বাঁচান আমার নীতি হতে পারে না। এর থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে মানুষের مَلِكْ (মালিক) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

আমরা একটা জিনিস ভাল বুঝি যে কোন মেশিন কেউ তৈরী করলে তা চালানোর নিয়ম-কানুন তার নিকট থেকেই শিখতে হয়। কিন্তু একথা কেন বুঝি না যে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তিনিই জানেন এ মানুষকে কি ভাবে চলতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْمُلْكُ সৃষ্টি যার রাষ্ট্রও তাঁর। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁরই আইন-কানুন চলবে কারণ তিনিই হচ্ছেন তার একমাত্র মালিক।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫২. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহমেদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫